আমি সিরাজের বেগম

শ্রী পারাবত

banglaboipdf.com

It isn't cover

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get More
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

Click here

আমি সিরাজের বেগম

আমি জারিয়া—ক্রীতদাসী। শুধু এইটুকুই জানি নিজের সম্বন্ধে। নবাব আলিবর্দির বিরাট মহলের অসংখ্য জারিয়াদের মধ্যে আমি একজন। কোথা থেকে এলাম, কে আমার মা, কে আমার বাবা, তাও জানি না। স্বপ্নের মতো শুধু একটা ছবি মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। সে-ছবি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো। গ্রামে খড়ে-ছাওয়া এক শান্তির নীড় দানবীয় আক্রমণে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল একদিন। আর্তনাদ করে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে কুটির থেকে ছুটতে ছুটতে বার হয়ে এলো এক নারী। বাইরে সারি সারি ঝক্‌ঝকে পোশাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসুরের দল—মুখে তাদের পৈশাচিক হাসি। তাদের সম্মুখে এক গ্রাম্য-যুবকের সুঠাম নগ্নদেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। সে-দৃশ্য দেখে আমাকে কোলে নিয়ে ওই নারী চিৎকার করে আছড়ে পড়ে। তারপর তার কি হয়েছিল স্পষ্ট মনে নেই। অসুররা তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। গৃহদাহের আগুনের সামনে বসে আমি কাঁদছিলাম। গায়ে লাগছিল তাপ, আর মাথায় যন্ত্রণা। নারীটি পড়ে যাবার সময় আঘাত লেগেছিল আমার মাথায়। সেই সময় এক মলিনবেশী পুরুষ চোরের মতো চুপিচুপি এসে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে পালিয়েছিল।

ব্যস্, এইটুকুই। আর কিছু মনে নেই। কিন্তু এ হয়তো শুধু স্বপ্নই। কোথা থেকে এলাম—এ কথা বয়স্ক জারিয়াদের জিজ্ঞাসা করলে তারা রেগে ওঠে। বেগমসায়েবাকে প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। যদিও তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমি চৌদ্দ বছরের বালিকা বলেই যে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ, তা নয়। আমার নাকি অসাধারণ রূপ! অনেক সময় কাছে ডেকে নিয়ে এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকেন বেগমসায়েবা, যে লজ্জা হয়। চারিদিকের বড় বড় আরশিতে নিজের রক্তিম মুখখানা ভেসে উঠতে দেখে মাথা নিচু করি।

বেগমসায়েবা আমার সে অবস্থা দেখে হেসে ওঠেন। আমাকে টেনে নিয়ে আমার বুকের দু'পাশে তাঁর দুই হাত চেপে ধরে বলেন, 'না, তুই এখনো ছোট আছিস্।' গা শিরশির করে ওঠে। তিনি হেসে তাকিয়ার ওপর গড়াগড়ি যান। আমি পালিয়ে আসি।

কিন্তু পালিয়ে যাবোই বা কোথায়? জারিয়াদের মধ্যে আমার স্থান নেই। আমি ওদের দু'চোখের বিষ। তাদের এই ব্যবহারে আমার চোখ ছলছল করে ওঠে। হামিদা তাই দেখে মুখ ভেঙচিয়ে বলে, 'কাঁদলে আমাদের মন ভিজবে না। রূপের দেমাকে তো মাটিতে পা পড়ে না। সব সময় শুধু বেগমসায়েবার কাছেই থাকিস্। এখন আবার এখানে কেন? সেখানে যা।'

হামিদারা সবাই যেন আমাকে হিংসা করে। আমার কি দোষ বুঝি না। বেগমসায়েবা যে মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে কথা বলেন, সে কি আমার অপরাধ? তাঁর কাছে যেতে আমারও তো ভয় করে। সে-কথা হামিদারা বুঝবে? বললেও বিশ্বাস করবে না।

তাই নির্জন এক গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিন কাটে। এ গবাক্ষের পাশ দিয়ে লোক চলাচল করে না। বেগম মহলের একেবারে নির্জন কোণে এটা। এখানে আমি নিশ্চিন্ত। নিজেকে খুঁজে পাই এখানে। সামনের বাগিচা পার হয়ে দূরের রাস্তা নজরে পড়ে এখান থেকে। সেখানে কত লোকের

মিছিল। কাটরার মসজিদের আজানধ্বনি এখানে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনি। কিরীটকণা গ্রামে কিরীটেশ্বরীর মেলায় যেতে নানা দেশ থেকে হিন্দুরা এই পথে নদীতে খেয়া পার হয়। আমি চেয়ে দেখি আর ভাবি, এদের সবারই আত্মীয়স্বজন, বাবা-মা রয়েছে। আমার তো কেউ নেই। আমার মতো কি একজনও এদের মধ্যে নেই?

এই গবাক্ষই আমার সান্ত্বনা, আশ্রয়ও। এখানে হাত রেখে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জায়গাটা হয়েছে মসৃণ। অজ্ঞাতে চোখের নোনা জল পড়ে পড়ে এর ধার হয়েছে বিবর্ণ। সেই মসৃণ বিবর্ণতাই যেন একে টেনে এনেছে আমার আরও কাছে, আমার পরম আত্মীয় করে তুলেছে। প্রাসাদের চাকচিক্য আর হৃদয়হীনতা যেন গবাক্ষ থেকে কিছুদূরে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর এগোতে পারে না। স্মৃতির অস্পষ্টতা যেদিন প্রথম দানা বেঁধে স্পষ্ট হয়েছে, সেদিন থেকেই আমার এই গবাক্ষ।

মনে আছে, যখন ছোট ছিলাম, এখানে দাঁড়িয়ে আমি বাইরের দৃশ্য দেখতে পেতাম না। আমার মাথা অত উঁচুতে পৌঁছতো না। নবাবের জুতো রাখার একটা ছোট চৌকি লুকিয়ে এনে রেখে দিয়েছিলাম এখানে। তার ওপর দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতাম বাইরের দিকে। এখন আর সে চৌকির প্রয়োজন হয় না। বেশ বড় হয়েছি।

সবসময় ভয় হয়, এখান থেকেও একদিন সবাই মিলে আমাকে সরিয়ে দেবে। এখনো কারও নজর পড়েনি, তাই। মহলের এই জায়গাটার গুরুত্ব এত কম যে নজরে পড়ার কথাও নয়।

তবু একদিন ঘসেটি বেগমকে এদিকে আসতে দেখে বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাকে সব জারিয়ারাই ভয় করে। তাকে দেখলেই সবার পা কাঁপে। জারিয়াদের দেখে দেখে আমার মনেও তার সম্বন্ধে একটা অজ্ঞাত ভীতিভাব জন্মেছিল। অথচ তার ওই রূপ, অমন টানা টানা চোখের দিকে চাইলে মনে হয় না যে তাতে ভয় পাবার মতো কিছু রয়েছে। অমন রূপ হয় শুধু বেহেস্তের পরীদের।

জারিয়াদের দেখাদেখি আমার মনে ভয় জন্মালেও তাদের মতো থরথর করে আগে কখনো কাঁপতাম না আমি। কিন্তু যেদিন দেখলাম, অমন অপরূপ চোখও আগুনের মতো জ্বলে ওঠে, অমন সুন্দর নাসারন্ধ্র রাগে বীভৎস দেখায়, যেদিন দেখলাম, নবাব নিজে এবং বেগমসায়েবা কন্যার প্রতাপের কাছে অসহায়ের মতো বোবা হয়ে গেলেন, সেদিন থেকে অন্যান্য জারিয়াদের মতো আমিও তার নামে কাঁপতে শুরু করলাম।

সেদিনের কথা আজও আমার মনে মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। মহলের পঞ্চাশটা আরশি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল ঘসেটি। আর সেই ভাঙা কাচ আমরা সবাই মিলে পরিষ্কার করেছিলাম। আমাদের কারও মুখে বিরক্তির মৃদু গুঞ্জনও শোনা যায়নি। কাচে অনেকের হাত ক্ষতবিক্ষত হলো, কিন্তু কেউ দাওয়াই-এর জন্যে হাকিম ডাকতে সাহস পায়নি। আরশির কাচে বিষ থাকে জেনেও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি কেউ।

অথচ সেদিন ঘসেটিকে অন্যায় কিছু বলেননি বেগমসায়েবা। নওয়াজিস মহম্মদ খাঁর সঙ্গে শাদি হয়েছে তার, কিন্তু তাঁর কাছে ঢাকায় যাবে না ঘসেটি, এ কেমন কথা? নওয়াজিস খাঁ মুর্শিদাবাদে এলে সে-কথা বেগমসায়েবা বলেছিলেন কন্যাকে। তাতেই এত কাণ্ড। যে-নবাবের রাজ্যে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, সেই নবাবের চোখের সামনে ঘসেটি উন্মাদের মতো একটার পর একটা আরশি ভেঙে ফেললো। চোরের মতো দাঁড়িয়ে দেখলেন নবাব আলিবর্দি স্বয়ং।

আরশি ভেঙে নবাবের সামনে ছুটে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে ঘসেটি বলল, 'নওয়াজিস যদি কখনো নবাব হয়, তবেই আমি তার কাছে যাবো, নইলে নয়।'

তার কথা শুনে নবাব আলিবর্দির মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠে আবার তখনই মিলিয়ে

গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে তুমি এখানেই থাকো।'

সেই ঘসেটিকে গবাক্ষের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠাই স্বাভাবিক। পালিয়ে যাবার উপায় নেই। আবার না গেলেও যে ভাগ্যে কি আছে কে জানে? পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ঘসেটি বেগম অন্যমনস্ক হয়ে হাসতে হাসতে আসছিল। নিজের মনে কি ভেবে নিজেই হাসছিল।

আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল সে। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকে কিছুদূর দ্রুত চলে গেল। সেই সুযোগে গবাক্ষ থেকে চট্ করে সরে এসে আমি একটা কোণে আশ্রয় নিলাম। রাত্রি না হলেও সূর্য ডুবে গিয়েছে তখন। যেখানে আশ্রয় নিলাম, সে জায়গাটা বেশ অন্ধকার, সহসা কারও চোখে পড়ার ভয় নেই।

সেখানে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি পদশব্দের অপেক্ষায়। কিন্তু অনেকক্ষণ কিছু শুনতে পেলাম না। ভাবলাম, হয়তো আর আসবে না সে। খেয়ালী বেগম আপন খেয়ালে এদিকে চলে এসেছিল, আবার চলে গিয়েছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াবো কিনা ভাবছি, এমন সময়ই সেই পদশব্দ। আমার বুকের ভেতর ধুক্‌ধুক্ শব্দ, তার তালে-তালে সর্বাঙ্গ নড়তে থাকে। ঘসেটির কানে সে শব্দ যাবে, ভয়ে দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরি।

কিন্তু একি! গবাক্ষের সামনে তো ঘসেটি বেগম নয়। এক অপরিচিত দীর্ঘদেহ পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। বেগম মহলে কিভাবে প্রবেশ করলো? এত লোকের চোখে ফাঁকি দিয়ে এখানে এলোই বা কি করে? নবাব বংশের কেউ নয়, সবাইকে তো আমি চিনি। তবে কে এই পুরুষ? একবার ভাবি, ছুটে গিয়ে বেগমসায়েবাকে খবর দিই। কিন্তু লোকটির কোমরে দীর্ঘ খরশাণ ঝুলতে দেখে ভরসা হলো না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কে জানে? অমন সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক যার চেহারা, সে কি কখনো খারাপ কিছু করতে পারে? এ চেহারার দিকে যে দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তবু বলা যায় না। চেহারা মাপকাঠি হলে ঘসেটিও অমন পিশাচী হতো না।

নবাবের কোনো অমঙ্গল হবে না তো? ভাবতেই গায়ের মধ্যে ছম্‌ছম্ করে। বেগমসায়েবাকে খবরটা দিতেই হবে। কিন্তু পুরুষটির পাশ দিয়ে যেতে গেলেই মাথা কাটা পড়বে। একদিকে মৃত্যুভয়, অপরদিকে নবাবের কথা ভেবে মনের ভেতর খচ্‌খচ্ করতে লাগল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ভয়কে জয় করবার উদ্দেশ্যে, তারপর চোখ খুলি। এবার ছুটতে হবে। মাথার ওড়নাকে কোমরে জড়াই। একবার লোকটিকে দেখতে হবে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে কিনা। বাইরের দিকে সে যদি চেয়ে থাকে তবেই ছুটে যাবার সুযোগ পাবো।

উঁকি দিতেই স্তম্ভিত হলাম। অপরিচিত পুরুষটির সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ঘসেটি বেগম, —ঘসেটির চোখ বাঘের মতো জ্বলজ্বল করে, তার নাক সাপের মতো ফোঁস্‌ফোঁস্ করে। আমার হাত-পা অসাড় হয়ে এলো। পুরুষটির আলিঙ্গনে ঘসেটির সারা দেহ নিষ্পেষিত হচ্ছে, যেন এখনই তার হাড়গুলো সব গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে পুরুষটি ছেড়ে দেয় তাকে, কিন্তু ঘসেটি ছাড়তে চায় না। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে চায় আরও নিষ্পেষণ।

আমার মাথা ঘুরে ওঠে। মনে হলো, একটা ঘোর অন্যায় ঘটে চলেছে বেগমমহলের মধ্যে। পুরুষটির চোখে-মুখেও তারই ছাপ। সে সংশয়চিত্তে এদিকে ওদিকে বারবার দৃষ্টি ফেলে—ধরা পড়ে যাবার ভয়, যেন পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু ঘসেটি উন্মত্ত। আরশি ভাঙার দিনে তাকে যেমন উন্মত্ত দেখা গিয়েছিল, এ তার চেয়েও বেশি। সেদিন তার চোখ-মুখ আজকের মতো রক্তিম হয়নি।

এ নিশ্চয়ই অন্যায়। বেগমসায়েবা আমার বুকের দু'পাশে দু'হাত রেখে চাপ দিলে সেটা যেমন অন্যায়, এ তার চেয়েও হাজার হাজার লক্ষগুণ অন্যায়।

চোখ বন্ধ করে কাঁপতে থাকি। হঠাৎ ঘসেটির আর্তনাদে চমক ভাঙল। চেয়ে দেখি, ছিন্নভিন্ন

পোশাক নিয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে সে, আর পুরুষটি অদৃশ্য হয়েছে।

খুন করে রেখে পালিয়ে গেল না তো? ছুটে ঘসেটির সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

আমাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে সে, 'কেন এসেছিস্ এখানে?'

'আপনাকে তুলবো?'

'না-না-না। কে তোকে তুলতে বলেছে?' ঘসেটি তাড়াতাড়ি পোশাক-পরিচ্ছদ সামলে উঠে দাঁড়ায়।

আমি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

'কোথায় ছিলি তুই?' তার চোখে আগুন।

আঙুল দিয়ে বিপরীত দিক দেখিয়ে দিই। কথা বলার শক্তি ছিল না আমার।

'আর কাউকে দেখেছিস্?'

'না তো!'

'ঠিক আছে। চলে যা আমার সামনে থেকে। দূর হ'.....

আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাই।

একেবারে বেগমসায়েবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হই। নবাব আলিবর্দির বেগম তখন আলবোলায় তামাক সেবন করছিলেন। বাইরের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে চেয়ে তিনি যেন কিসের চিন্তায় মশগুল। নবাবের জন্যে হয়তো ভাবনা হয়েছে। বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন নবাব।

জারিয়ারা বলাবলি করে যে, নবাব তো শুধু যুদ্ধ করেন, রাজ্যের বাকি চিন্তা সবই বেগমসায়েবার। তাঁর পরামর্শেই নাকি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। আমি অতশত বুঝি না, তবে এটুকু জানি যে, নবাব তাঁর সব কথাই শোনেন। তাঁর কপালে আজ যেমন রেখা ফুটে উঠেছে, নবাবের সঙ্গে আলোচনার সময়ও ঠিক এমনি রেখাই ফুটে ওঠে।

বেগমসায়েবার ঘরে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়ে বুঝলাম মস্ত ভুল করেছি। তিনি যদি প্রশ্ন করেন, কি জন্যে এসেছি তাহলে তো ঘসেটি বেগমের কথা বলা যাবে না। সে শুনতে পেলে আমার প্রাণ থাকবে না। হামিদার বোনের মতো দশা হবে। সামান্য দোষে তাকে বেগম মহলের ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার হুকুম দিয়েছিল ঘসেটি। শুধু হুকুম দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সমস্ত জারিয়াদের ছাদের ওপর দাঁড় করিয়ে বলেছিল যে, অবাধ্য হলে জারিয়াদের কি দশা হয় স্বচক্ষে দেখতে। হামিদার বোন তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু ফল হয়নি। নিজের হাতে ঘসেটি নাকি তাকে ঠেলে দিয়েছিল ওপর থেকে।

আমি হামিদার বোনকে দেখিনি। অন্তত স্মৃতিকে তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তার কোনো হদিশ পাই না। তবু সে-দৃশ্য আমার চোখে স্পষ্ট ভাসে।

বেগমসায়েবাকে অন্যমনস্ক দেখে চুপিচুপি পালিয়ে আসবো ভাবলাম। কিন্তু দরজা পর্যন্ত যেতেই তাঁর কণ্ঠস্বরে থামতে হলো।

'শোন্।'

আমি তাঁর দিকে ঘুরে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

'এদিকে আয়।' গম্ভীর আদেশ। এক-পা এক-পা করে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই।

'কি চাস্?'

'কিছু না।'

'কেন এসেছিলি তবে?'

'পা টিপে দেবো?' আমার গলা কেঁপে ওঠে।

'তুই তো কোনোদিন পা টিপিস না।'

'না টিপলে যে শিখতে পারবো না।' শেষ চেষ্টা করি সহজ হবার।

আমার কথায় বেগমসায়েবার মুখে মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে যায়। তিনি বলেন, 'তোর এতটুকু হাতে কি আমার আরাম হবে?'

'তবে থাক্, আমি যাই বেগমসায়েবা।' যেন পালাতে পারলে বাঁচি। দরজার দিকে এগিয়ে যাই আবার।

'শুনে যা।' বেগমসায়েবার মুখে বিরক্তি দেখে ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

'কি বলতে এসেছিলি বল্?' তাঁর চোখে ঔৎসুক্য।

'কিছু বলতে আসিনি, বেগমসায়েবা।' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিই।

'মিথ্যে কথা বলছিস্। ঠিক করে বল্।' তাঁর স্বর বজ্রকঠিন।

আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। তিনি স্থির হয়ে বসে থাকেন। তাঁর চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ। আপ্রাণ চেষ্টায় তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিই।

'এবার বল্। কি দেখে ভয় পেয়েছিলি, কেন ছুটে এসেছিলি এখানে?'

আমি স্তম্ভিত হলাম। বাইরের দিকে অন্যমনস্কের মতো চেয়ে থাকলেও তিনি আমার সব হাবভাবই লক্ষ্য করছিলেন প্রথম থেকে। বুঝলাম, ফাঁকি দিতে পারবো না। জারিয়াদের কথা এতদিনে বিশ্বাস হলো যে, কোনো জিনিসই বেগমসায়েবার দৃষ্টি এড়ায় না।

কিন্তু আমি কি বলবো তাঁকে? সত্যি বললে কালই হয়তো ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। মিথ্যে বললে নবাবের আদেশে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। পৃথিবীতে আমার যে কেউ নেই। কোথায় আশ্রয় পাবো? তার চেয়ে মৃত্যুই ভালো। কার ওপর অভিমানে জানি না, চোখ ফেটে জল বার হয়ে আসতে চাইল।

বললাম, 'বেগমমহলে কে যেন এসেছিল।'

'কি বল্লি!' তিনি বিস্মিত হন।

'একজন পুরুষকে দেখলাম।'

'কে সে?'

'চিনি না।'

'কেমন দেখতে?'

যেমন দেখছি, আমি বর্ণনা করে গেলাম।

'হুঁ, আর কেউ ছিল?'

'না।'

'ঠিক করে বল্ বাঁদরী।' তিনি রীতিমতো উত্তেজিত হন। পালঙ্ক ছেড়ে ছুটে এসে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকান।

'আর কাউকে আমি দেখিনি, বেগমসায়েবা।'

'ঘসেটিকে দেখিসনি?'

মনে হলো, প্রচণ্ড আঘাতে আমার মন এবং শরীর দুই-ই গুঁড়িয়ে গেল। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

'বল্ বল্ বল্। চুপ করে আছিস কেন? ঘসেটিকে দেখিস্নি?'

'না-না, খোদার কসম।' বেগমসায়েবার পায়ের কাছে আমি ভেঙে পড়ি। পা দিয়ে তিনি যদি আমার গলা টিপে ধরেন সেও ভালো। তাতে মিথ্যাবাদীর শাস্তি হবে, কিন্তু ঘসেটির হাত থেকে তো বাঁচবো।

বেগমসায়েবা কিছুই করলেন না। তিনি সেইভাবে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে

গিয়ে তাকিয়ার ওপর মাথা রাখেন। আমি নিচেই বসে থাকি।

খানিক পরে তিনি বলেন, 'তুই এখন যা।' আমি উঠে দাঁড়াতে আবার বলেন, 'যদি তাকে আর কখনো দেখিস্, সঙ্গে সঙ্গে এসে বলবি। নইলে তোকেই মেরে ফেলা হবে।'

কুর্নিশ করে চলে আসি।

দু'দিন পরে দলবল নিয়ে বেগমসায়েবা ভোরবেলা গিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সারাদিন তিনি না খেয়ে সেখানে থাকবেন, সন্ধে হলে ফিরে আসবেন। প্রতি বছরই এইদিনে তিনি যান গিরিয়ার প্রান্তরে। এইদিনে সেখানে নবাব আলিবর্দি সফররাজকে পরাজিত করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদ পেয়েছিলেন। বেগমসায়েবা দিনটিকে পবিত্রভাবে পালন করেন।

বেগমমহল প্রায় ফাঁকা। নবাব আলিবর্দিও মুর্শিদাবাদে নেই। বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। আমার অতি প্রিয় গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো ভাবছি, এমন সময় সোফিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে।

জারিয়াদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। তারপরই সোফিয়া। তার বয়স ষোলো। শরীরে তার স্বাস্থ্য আছে, দেহের গঠনও সুন্দর, কিন্তু রঙটা বড় কালো। কালো রঙের জন্যে তার দুঃখের সীমা নেই। তার দুঃখ দেখে আমার হাসি পায়। সে আমাকে চুপি চুপি একদিন বলেছিল যে, রঙ যদি তার আমার মতো হতো, তাহলে সে কোনো নবাবজাদাকে শাদি করতে পারতো।

নবাবজাদাদের শাদি করার জন্যে এদের এত লোভ কেন বুঝি না। চুনি-পান্নার অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করা যায় বটে, মসলিন দিয়ে শুভ্র দেহকে ঢেকেও রাখা যায়, কিন্তু তাতে কি সুখ আছে? আমার ধারণা, বেগমদের সুখ নেই। সবাই ঘসেটি বেগমের মতো ভেতরে ভেতরে জ্বলে মরছে। ঘসেটি শুধু প্রকাশ করে, অন্য সবাই মনের মধ্যে চেপে রাখে। সত্যি কিনা জানি না, কতটুকুই বা আমার অভিজ্ঞতা, তবু বুঝতে পারি, বেগমদের মন বড় নীচু, বড় কুৎসিত। নিজেদের সাজিয়ে রাখলেও এদের নাসারন্ধ্র দিয়ে পচা মনের দুর্গন্ধযুক্ত দীর্ঘশ্বাসই শুধু বার হয়। সেদিন গবাক্ষের সামনে ঘসেটির নাক দিয়েও হয়তো তেমনি শ্বাস নির্গত হয়েছিল, যা সহ্য করতে না পেরে সেই বিরাট পুরুষটিও পালিয়ে যায়।

নবাব আলিবর্দির মতো মানুষ আর কয়জন হয়? তাঁর মতো একজন মাত্র বেগম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে কয়জন নবাব পারে? নিজের প্রতিভায় নবাব হয়েও তাঁর মনে আর বাইরে কোনো জাঁকজমক নেই। তিনি যেন বাংলাদেশের সাধারণ একজন মানুষ, একটি মাত্র স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পেতেছেন। হাজার বেগমের হীন প্রতিযোগিতায় তাঁর মন দ্বিধাবিভক্ত নয়।

বেগমসায়েবাও তেমনি নবাব ছাড়া কিছু জানেন না। তাঁর মনে সর্বদা একই চিন্তা। সে-চিন্তা নবাবের দেহের জন্যে, তাঁর জন্যে, আর রাজ্যের জন্যে। বেগমসায়েবাকে তাই আমার বড় ভালো লাগে। তিনি যখন তখন আমার বুকে হাত দিয়ে ছোট আছি বলে ঠাট্টা করলেও তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধাও রয়েছে।

কিন্তু সবাই আলিবর্দি আর তাঁর বেগম নন। নবাবের দৌলতে নবাব-পরিবারভুক্ত হয়ে, তাঁর আত্মীয়স্বজনদের বেগমের ছড়াছড়ি। বেগমরা যেন মাটির পুতুল। তাদের যেন প্রাণ নেই, মন নেই, সুখ নেই, সাধ নেই। অবসর মতো এক-আধ দিন পুরুষ এসে একটু নাড়া দিয়ে গেলে তারই স্মৃতি নিয়ে তারা আনন্দে জাবর কাটবে বাকি দিনগুলি। তবু যদি বোঝা যেত পুরুষদের মন বাঁধা রয়েছে তাদের কাছে।

অথচ আশ্চর্য, বেগমরা ঠিক সেইভাবেই জাবর কাটে। একদিন এসে পুরুষ যদি দু'দণ্ড কারও ঘরে কাটিয়ে যায়, তবে দেমাকে সেই বেগমের একমাস মাটিতে পা পড়ে না। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে যখন

কিছুদিনের জন্যে ছিলাম, তখন সেখানেও ওই রকমই দেখেছি।

তাই সোফিয়ার বেগম হবার সখ দেখে আমার কষ্ট হয়। মনে হয়, যদি সম্ভব হতো, আমার গায়ের রঙ তাকে দিয়ে, তার গায়ের রঙ নিয়ে আমি কোনো সিপাহীকে বিয়ে করে চলে যেতাম তার কুটিরে। কত সুন্দর সুন্দর সিপাহীদের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখি, কত রকম বয়স তাদের। তাদের নিশ্চয়ই ঘর আছে, ঘরে মা আছে, ভাই-বোন রয়েছে। সেখানে দশটা বেগমের প্রতিযোগিতা নেই। আমি গেলে আমিই সব।

সোফিয়া এসে আমার হাত ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'শিগ্‌গির চল্, ছাদে পালাই।'

দেখলাম, সব জারিয়ারাই দুর্‌দার্ করে ছাদে উঠে যাচ্ছে। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, 'কেন?'

'হোসেন কুলিখাঁ আসছেন।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'ন্যাকা, কিছুই জানে না যেন। বেগমসায়েবা নেই, ঘসেটি যদি আমাদের এখানে দেখে, তাহলে কি আস্ত রাখবে?'

'কেন?'

'যাবি তো চল্। অত বুঝিয়ে বলার সময় নেই।'

'আমি যাবো না।'

'তবে মর্।' সোফিয়া আমাকে ছেড়ে ছুটে পালায়।

হোসেন কুলিখাঁকে চোখে দেখিনি কখনো, নাম শুনেছি। ঢাকায় নওয়াজিস খাঁর ডান হাত তিনি। তাঁর বুদ্ধি আর বীরত্বের কথা সকলে জানে। স্বয়ং নবাবকেও অনেক সময় তাঁর সম্বন্ধে বেগমসায়েবার কাছে প্রশংসা করতে শুনেছি। সেই হোসেন কুলিখাঁকে দেখে জারিয়াদের এত ভয় কেন, বুঝলাম না। আর ঘসেটি বেগমই বা কেন এতে বিরক্ত হবে?

হোসেন কুলিখাঁকে দেখার অদম্য কৌতূহল হলো। ছুটে গিয়ে বেগম মহলের বাইরের সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সেই পথেই তিনি আসবেন ঘসেটি বেগমের সঙ্গে দেখা করতে। নওয়াজিস খাঁ কোনো সংবাদ পাঠিয়েছেন বোধহয়?

ভারী পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকাতেই স্তম্ভিত হই, সর্বাঙ্গ পাষাণ হয়ে যায়। মনে হয়, একটু পরেই বুঝি পড়ে যাবো। ডান হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি দেয়াল চেপে ধরি। মুহূর্তে বুঝতে পারি, জারিয়ারা কেন সরে পড়েছে।

সেদিনের গবাক্ষের সামনের সেই অচেনা পুরুষ। সেই পুরুষই তবে হোসেন কুলিখাঁ! কাজের তাগিদে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসে, আর প্রভুর বেগমের বার্তা নিয়ে যাবার অছিলায় প্রভুর সর্বনাশ করেন। সরল ভালো মানুষ নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ। ভৃত্য আর বেগমের ওপর তাঁর অবিচল আস্থা। পৃথিবীতে কি ভালো মানুষেরা শুধু প্রতারিতই হয়?

হোসেন কুলিখাঁ আমার সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন। সংযত হয়ে তাঁকে কুর্নিশ করি। তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

তিনি বলেন, 'তুমি জারিয়া?'

ঘাড় নাড়ি।

'খুবসুরৎ। কিন্তু বড় ছোট।' আপন মনে শিস্ দিতে দিতে তিনি এগিয়ে যান। আমি তাঁকে অনুসরণ করি।

ঘসেটি বেগম আগেই ঘর থেকে বার হয়ে এসেছিল। হোসেন কুলিখাঁর পেছনে আমাকে দেখে সে

রাগে ফেটে পড়ে। চিৎকার করে ওঠে, 'এখানে কি করছিস্ হতভাগী?'

আমি চুপ করে থাকি। ঘসেটি ছুটে আসে আমার দিকে। হোসেন কুলিখাঁ নিমেষে আমাকে আড়াল করে দাঁড়ান।

'সরে যাও। ওকে আমি শেষ করবো। মিটমিটে শয়তান কোথাকার।'

গম্ভীর স্বরে হোসেন কুলিখাঁ বলেন, 'থাক্ বেগমসায়েবা, এতটুকু মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া কোনো অপরাধ তো সে করেনি।'

'ওকে চেনো না তুমি। আমিই কি চিনতাম? এখন বুঝছি।'

'মুখ দেখেই চেনা যায়। একটি সরল সুন্দরী পরী। শুধু ছোট। কিছুদিন পরেই মাথা ঘুরিয়ে দেবে অনেক পুরুষের।' তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন।

'তোমারও মাথা ঘুরিয়েছে নাকি?' ঘসেটি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। তার ঠোঁট বিকৃত হয়।

'হ্যাঁ, দূর থেকে দেখে ঘুরেছিল বৈকি। তখন বয়সের তো আন্দাজ করতে পারিনি।'

ঘসেটি আচমকা হোসেন কুলিখাঁর পাশ কাটিয়ে আমার পেটে পদাঘাত করে। অসহ্য যন্ত্রণায় সেখানেই বসে পড়ি। চোখের সামনে সব কিছু ঘুরতে থাকে। তারপর ঝাপসা হতে হতে সব অন্ধকার হয়ে যায়। মরার আগে বুঝি এমনই হয়।

কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি না। যখন জ্ঞান হলো, দেখলাম, তারা দু'জনেই চলে গিয়েছে। বিরাট মহলের বাইরে আমি একা। চোখে জল এলো। মনের মধ্যে আবছা একটা নারী-মুখ ভেসে উঠল—যে নারী আমাকে কোলে নিয়ে আগুনলাগা কুটির থেকে ছিট্‌কে বার হয়ে এসেছিল। একি শুধু স্বপ্ন? স্বপ্ন হলে এত ঘনঘন ভেসে ওঠে কেন মনের মধ্যে? সেদিন ওই রমণী আমাকে নিয়ে আঙিনায় আছড়ে পড়লে আমার মাথায় যে আঘাত লেগেছিল, সেই আঘাতেরই চিহ্ন কি মাথার পেছনের ওই কাটা দাগ? জানি না। বলে দেবার কেউ নেই। যে বৃদ্ধা জারিয়া আমাকে মানুষ করেছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো কিছুটা বলতে পারতো।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াই। কাউকে দেখতে পাই না। সবাই ছাদে লুকিয়ে রয়েছে। গবাক্ষের সামনে গেলে হয়, কিন্তু সাহস হয় না। আজও যদি ওরা সেখানে গিয়ে থাকে।

বেগমসায়েবা এলে তাঁকে বলবো নাকি, যে পুরুষটিকে আমি সেদিন দেখেছি সে হোসেন কুলিখাঁ। আর হ্যাঁ, ঘসেটি বেগমকেও দেখেছি তাঁর সঙ্গে—দেখেছি, আলবৎ দেখেছি। কিন্তু তাহলে যে হোসেন কুলিখাঁর প্রাণ যাবে। তাঁর মৃত্যু আমি চাই না। অমন বীরের মতো চেহারা যাঁর, তাঁর মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রেই হওয়া উচিত। তাছাড়া লোকটা খারাপ নয়। তাঁর মিষ্টি কথার মধ্যে সহানুভূতি ঝরে পড়ে।

ভাবতে ভাবতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাই। কিন্তু আবার বসে পড়তে হলো। পেটের ভেতরে ভীষণ ব্যথা করে ওঠে।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। মাথায় কার হস্তস্পর্শে চমকে উঠি। চেয়ে দেখি হোসেন কুলিখাঁ।

'খুব লেগেছে?'

'না।'

'নিশ্চয় লেগেছে।'

কথা বলি না।

'আমার সঙ্গে ঢাকায় যাবে?'

'না।'

'এখানে তবে অত্যাচার সহ্য কর।'

'আমরা যে জারিয়া। আমাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়।'

'ও।' চিন্তাকুল অবস্থায় তাঁকে নেমে যেতে দেখি। সুন্দর তাঁর চলার ভঙ্গী। নবাব আলিবর্দির চেয়েও

সুন্দর। কী চমৎকার দেহের গঠন। একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। পেটের ব্যথার কথাও ভুলে যাই কিছু সময়ের জন্যে।

নাকাড়াধ্বনিতে একদিন খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায়। মহলের এত বড় প্রাঙ্গণ পার হয়েও পথের নাকাড়াধ্বনি সকলকে জাগিয়ে তুলল। ছুটতে ছুটতে এসে একজন খবর দিয়ে যায় যে, নবাব বর্গীদের বিতাড়িত করে ফিরছেন। বেগমসায়েবার কাছে খবর পৌঁছল। তিনি উঠে এসে বেগম মহলের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ালেন, হোসেন কুলিখাঁ এলে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। বেগমসায়েবা জানেন যে, নবাব এসে চেহেল-সেতুনে যাবেন না, অন্য কোথাও যাবেন না, প্রথম তাঁর কাছেই আসবেন। নবাবের সঙ্গে তাঁর আদুরে নাতিটিও আসবে। সেও যুদ্ধে গিয়েছিল। তাকে আমি এড়িয়ে চলি। আমার চেয়ে আর কতটুকু বা বড় হবে সে। অথচ তার প্রতাপে নবাব পর্যন্ত কম্পিত। ঘসেটি বেগমের ওপর সে আর এক-কাঠি। কখন যে কি চেয়ে বসে ঠিক নেই। অথচ যা চাইবে, না দিলে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। ঘসেটি বেগম শুধু আরশি ভাঙে, এ হয়তো মানুষের মাথা ভাঙবে। নবাবের মুখ দেখে বোঝা যায়, নাতিটিকে ভালোবাসলেও তার জন্যে তিনি সর্বদা তটস্থ। তাকে যুদ্ধে নিয়ে গিয়ে তিনি ভালোই করেছিলেন। নইলে তাঁর অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে বসে থাকতো।

ছেলেটার সুন্দর কচি মুখ। দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। অথচ সে যদি দেখতে পায় যে, তার মুখের দিকে আমরা কেউ চেয়ে আছি, তাহলে রেগে উঠে বলবে, হাঁ করে দেখছিস্ কি বাঁদী? মুখে কি মধু আছে?

মধুই আছে। কিন্তু মুখ ফুটে কি বলতে পারি? কেন জানি না, ওকে দেখলে মায়া হয়। একলা দাদুর কাছে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবে। হয়তো পাটনার কথাই ভাবে। সেখানে তার বাবা-মা রয়েছেন। সবাই তো আমার মতো নয়।

ও যখন চিন্তা করে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। ভাবতে ভাবতে কখনো ওর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কখনো বা একটা বিষাদের ছায়া সারা মুখখানাকে অন্ধকার করে দেয়। তখন কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভরসা পাই না। মাথার মধ্যে ওর দুষ্টু বুদ্ধির তো অন্ত নেই। আমাব ঔদ্ধত্য দেখে কি আদেশ করবে কে জানে? বয়স কম হলে কি হবে, কারও তো জানতে বাকি নেই যে, বাংলার মসনদে আলিবর্দির পরে ওই ছেলেই বসবে। আর সে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন ও নিজে।

আমার প্রিয় গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। নবাবকে তারা অভ্যর্থনা জানাবে।

হর্ষধ্বনির মধ্যে নবাব তাঁর নাতিকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। মহলের প্রধান ফটক বন্ধ হলো। বাইরের জনতার চাপে সে-ফটক ভেঙে যায় আর কি? দু'জন সিপাহীকে ছুটে যেতে দেখলাম খরশাণ হাতে জনতার দিকে। নবাব সেদিকে চেয়ে থেমে গেলেন। হস্তীপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে নামলেন। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন বন্ধ ফটকের দিকে। জনতাকে সম্বোধন করে কি যেন বললেন। আবার একটা আকাশ ফাটানো চিৎকার। মহলের সামনের রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায় ধীরে ধীরে। প্রজাদের আনন্দে নবাবও আনন্দিত। আনন্দ তাদের উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছিল। তাতে সিপাহীরা রাগলেও নবাব রাগেননি। তিনি ধীরভাবে তাদের বুঝিয়ে ফিরে এলেন।

এবার আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বেগমসায়েবার ঘরের সামনে দাঁড়াই। জানি নবাব সেখানেই আসবেন। একটা ঝাড়ন জোগাড় করে নিই। তাঁদের কথাবার্তার সময়ে নিজেকে কোনো কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। বয়স কম বলে সুবিধে আছে। অন্য জারিয়ারা ঘরে কিংবা আশেপাশে থাকলে তিনি তাদের চলে যেতে বলেন, কিন্তু আমাকে কিছু বলেন না। ফলে তাঁদের অনেক কথাই আমি শুনতে

পাই।

নাতিকে নিয়ে নবাব আর বেগমসায়েবা ঘরে ঢুকলেন। আমি বাইরের আসবাবপত্রে ঝাড়ন বুলিয়ে চলি। ঘরের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে হবে যতটুকু শোনা যায়।

শুনতে পেলাম, বেগমসায়েবা বলছেন, 'অনেকবারই তাড়ালে ওদের, কিন্তু শেষ তো হয়নি। এবারে কি শেষ করে দিয়ে এলে?'

'না, পণ্ডিত না মরলে ওরা শেষ হবে না।'

'তাহলে পণ্ডিতকে মারো।'

'পারছি কই?' নবাবের স্বরে হতাশা।

'কৌশলে চেষ্টা করে দেখো।'

'পরের বার এলে তাই করতে হবে। অত বড় বীরকে কৌশলে মারতে লজ্জা হয়।'

'বীর! বলছো কি তুমি? বীরেরা নিরীহ লোকদের ওপর অত্যাচার করে? তারা সামনা সামনি যুদ্ধ করে। তারা লুঠ করে না। সাধারণ লোককে নির্মমভাবে হত্যাও করে না।

'ওরা বাধ্য হয়ে লুঠ করে। ওদের টাকার প্রয়োজন।'

'তাতে আমাদের কি? আমরা বাধ্য হয়ে পণ্ডিতকে বধ করবো, আমাদের শান্তি প্রয়োজন।'

শ্রান্ত নবাব আর কোনো কথা বলেন না।

বেগমসায়েবা বলেন, 'শুনেছি ওরা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সামর্থ্য থাকলে তা করুক। কিন্তু নিরীহ লোকদের ধন-প্রাণের বিনিময়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ওদের যদি সেটাই আদর্শ হয়, তবে তার পথও হওয়া চাই পাপবর্জিত!'

'হু।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমার হাতের ঝাড়নটা হাতেই রয়েছে। কিছুই পরিষ্কার করা হয়নি। এবারে দরজার আর একটু কাছে এগিয়ে এসে এটা-ওটা যা সামনে পাই পরিষ্কার করি। ভেবেছিলাম, যুদ্ধ সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনী শুনতে পাবো। কিন্তু কোনোরকম আলোচনা হলো না দেখে একটু হতাশ হয়ে পড়লাম। যুদ্ধ জিনিসটাও নবাব-বেগমদের কাছে যেন সাধারণ ব্যাপার।

হঠাৎ একসময় বেগমসায়েবার গলা শুনি, 'আমাদের দাদুর খবর কি?'

বুঝলাম, এবার নাতিকে একচোট আদর জানানো হবে। এতক্ষণের গম্ভীর আলোচনার সুর হঠাৎ পাল্টে গেল। আমি কান খাড়া করি।

'আমার খবর এই যে, সিরাজ একটা কিছু দেখাল বলে মনে হয়।' তেমনি উদ্ধত গলা। এতদিনের অবর্তমানেও একটু বদলায়নি। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিশ্রম আর কাঠিন্য ভোগ করে এসেও বেগমসায়েবার স্নেহসিক্ত কথার জবাবে এতটুকু নমনীয়তা প্রকাশ পেল না। তবু কত মিষ্টি। যেমন চেহারা, তেমনি কণ্ঠস্বর। স্বভাবটা আল্লা অমন করে গড়লেন কেন? নবাবজাদাদের কি অমনই হতে হয়? এতটুকু দয়া, এতটুকু মমতা কি থাকতে নেই? তা যদি না থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ প্রজার পুঞ্জীভূত ব্যথার কথা কিভাবে জানতে পারবে? প্রজারা যে নবাবের মুখ চেয়েই বেঁচে থাকে। প্রজাদের দুঃখ নিজের বলে অনুভব না করলে নবাব কিসের? নবাব আলিবর্দি তো অমন নন। এই তো একটু আগে হাতি থেকে নেমে নিজে এগিয়ে গেলেন ফটকের দিকে। প্রজাদের মনের খবর তিনি রাখেন বলেই কিভাবে শান্ত করতে হয়, সে কৌশলও তাঁর জানা। একজন সামান্য সিপাহী যা বুঝতে পারল না, তিনি তা বুঝলেন।

সিপাহী হয়তো বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু নবাবের চোখের সামনে কাজ দেখাবার সৌভাগ্য বড় একটা হয় না তাদের। তাই অতি উৎসাহে খরশাণ হাতে ছুটে গিয়েছিল প্রজাদের দিকে। নবাব বাধা না দিলে সে কি করতো কে জানে? বীরকে অভিনন্দন জানাতে এসে দু'একজনের হয়তো মাথাই কাটা পড়তো আজ। তাতে তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পেত না।

আলিবর্দি শুধু প্রজাদের মনের কথাই জানেন, তা নয়। সিপাহীর মনের খবরও তিনি রাখেন। তাই তার অতি উৎসাহে তিনি মনে মনে হয়তো হেসেছিলেন। কোনো শাস্তি দেননি তাকে। একেই বলে নবাব। তাঁর নাতিটি কি অমন হবে?

বেগমসায়েবার ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বর শুনলাম, 'উঃ এতখানি কেটে গিয়েছে?'

'যুদ্ধে গেলে অমন হয়েই থাকে। তোমাদের মতো বেগম মহলে বসে থাকা তো আমাদের কাজ নয়।' গর্ব ঝরে পড়ে সিরাজের কথায়।

নবাব আলিবর্দির হাস্যধ্বনি শোনা গেল।

বেগমসায়েবা বলেন, 'তুমি হাসছো? ঘা যে এখনো শুকোয়নি। তখনই বলেছিলাম, একে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। এতটুকু বয়সে কেউ যুদ্ধে যায়?'

'যায় বৈকি। গিরিয়ার যুদ্ধে জালিম সিং-এর কথা মনে নেই তোমার? সে তো সিরাজের চেয়েও ছোট ছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে তুমিই না একদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলে। আজ ভুলে যাচ্ছো কেন?'

'জালিম সিং-এর কথা জীবনেও ভুলবো না, নবাব। তার মুখে যা দেখেছি তোমার মুখেও তা দেখিনি।'

'এবার বর্গীর যুদ্ধে আমি সিরাজের মুখে কিন্তু তা দেখেছি। প্রথমে আমারও মনে হয়েছিল, ওকে নিয়ে গিয়ে হয়তো ভুল করেছি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ওর দিকে চেয়ে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠতো। সিরাজকে এত ভালোবাসি, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যদি সে ফিরে না আসতো তবু আপশোষ হতো না।'

'তুমি পরিশ্রান্ত নবাব। হিসেব করে কথা বলার মতো অবস্থা তোমার নেই। তাই যা-তা বকে চলেছো।' মনে হলো, বেগমসায়েবা নবাবের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। সিরাজ যে তাঁর নয়নের মণি।

সিরাজ হেসে ওঠে।

'হাসলি যে?' বেগমসায়েবা প্রশ্ন করেন।

'দাদু সারা রাত্রি ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কালও একথা বলেছিল।'

'সত্যি! নবাব কি পাগল হয়েছে?'

'না বেগমসায়েবা, পাগল হলে ওকথা বলতে পারতাম না। সিরাজের হাতের ক্ষতচিহ্ন দেখে তুমি দুর্ভাবনায় মরছো, আর আমার গর্ব হচ্ছে। সিরাজেরও হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করে দেখো।'

'হচ্ছেই তো। এবার ওরা এলে আমি একা যুদ্ধ যাবো। তোমাকে যেতে দেবো না, দাদু। তুমি বুড়ো হয়ে পড়েছো।'

নবাব মৃদু হেসে বলেন, 'থাক্, খুব বাহাদুরি হয়েছে। এবারে পোশাকগুলো ছেড়ে এসো তো। আমি হাকিম ডাকতে পাঠাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি চলে যেতে চেষ্টা করি, কিন্তু তার আগেই ছুটতে ছুটতে বাইরে বার হয়ে আসে সিরাজ।

'এই, এখানে কি করছো?'

একটা আরশির ওপর ঝাড়ন বুলিয়ে চলেছিলাম, বললাম, 'এটা পরিষ্কার করছি, নবাবজাদা।'

'উহুঁ, মিথ্যে কথা। এখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলে।'

তার কথায় স্তম্ভিত হই। বেগমসায়েবা কোনোদিন সন্দেহ করেননি, অথচ সিরাজ ঠিক ধরে ফেললো। নবাব হতে হলে এমন বুদ্ধিমান বুঝি হতে হয়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। জানি, শাস্তি একটা পাবোই। কিন্তু সেটা কতখানি গুরুতর হবে ভেবে উঠতে চেষ্টা করি।

সিরাজ এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলে, 'চলো'।

'কোথায় নবাবজাদা?' ভয়ে কেঁপে উঠি। কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম। সোফিয়া! হ্যাঁ,

সোফিয়াকেই দেখেছিলাম প্রথমে। ছুটতে ছুটতে সে ছাদে উঠছিল নবাবকে দেখার জন্যে। মনে মনে তার মুণ্ডপাত করি।

'আমার ঘরে চলো।'

'আপনার বেগমসায়েবারা যে অসন্তুষ্ট হবে।'

'বেগমসায়েবাদের কাছে যাচ্ছি নাকি আমি!'

'তাঁরা হয়তো বসে আছেন আপনার ঘরে। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এতদিন পরে ফিরলেন তো।'

'তারা বসে থাকে না। আমার জন্য তাদের মাথাব্যথা নেই। তারা নিজেদের নিয়েই মশগুল।' কথাটা সাধারণভাবে বললেও তাঁর কচি কণ্ঠস্বরে একটা ব্যথা ফুটে উঠল। বুঝলাম, নবাব আর তাঁর বেগমের বুকভরা ভালোবাসা পেয়েও এই কিশোর-হৃদয় তৃপ্ত নয়। কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গিয়েছে, যে-ফাঁক এর বেহিসাবী মনকেও ব্যথিত করে তুলেছে। প্রথম যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বেগমদের ধরন-ধারণ আর তাদের মন যেন চিনে ফেলেছে সিরাজ। তবু সামান্য জারিয়ার কাছে এমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলল কেন সে? অল্প বয়স বলেই কি মাঝে মাঝে নিজের মর্যাদা বজায় রেখে চলতে ভুলে যায়? আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, সে যেন হামেশাই এমন ভুল করে।

তার ওপর সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল। এতদিন তাকে বাংলার নবাবের উদ্ধত আদুরে নাতি বলেই জানতাম। জানতাম, সিরাজের কোনো বাসনাই অপূর্ণ থাকে না। আজ জানলাম, তার মনের নিভৃত কোণে এমনি কোনো কামনা রয়েছে যা আজও অপূর্ণ। ভবিষ্যৎ বাংলার নবাব সেখানে ভিখারী। আমার বুকের ভেতরটা টন্‌টন্ করে উঠল। যদি পারতাম, বুকের রক্ত দিয়েও পূর্ণ করতাম সিরাজের মনের বাসনা। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। আমি যে জারিয়া। ভালোবাসা আমার পক্ষে পাপ। ভালোবাসলেও সে ভালোবাসার প্রকাশ অমার্জনীয় অপরাধ।

আমি কি সত্যিই সিরাজকে ভালোবেসে ফেললাম? এত সহজে কি করে তা সম্ভব? আমি যে কোনো নাম-না-জানা সিপাহীর ঘরে যেতে চাই। কিন্তু এই মুহূর্তে যেতে ইচ্ছে করছে না কেন? সিরাজের বলিষ্ঠ হাত আমার বাঁ-হাতখানাকে ধরে রয়েছে বলেই কি?

'অমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? চলো, আমার জুতো খুলে দেবে।'

'চলুন, নবাবজাদা।'

সিরাজের ঘরে গিয়ে দেখলাম, সত্যি কোনো বেগম নেই সেখানে। তারা নিজেদের মহলে তখনো নিদ্রা যাচ্ছে নিশ্চয়। অথচ স্বামী ফিরছেন শুনে আলিবর্দির বেগম এই বয়সেও ভোরবেলা উঠে কেমন সিঁড়ির কাছে গিয়ে একা দাঁড়িয়েছিলেন। কত তফাৎ? আলিবর্দি সত্যিই ভাগ্যবান। তাই তাঁর ভাগ্যাকাশের সূর্য কখনো অস্ত যাবে না—যেতে পারে না। বেগমসায়েবাও ভাগ্যবতী। নবাবের গৃহিণী হয়েও কোনো ভাগ না দিয়ে সব সুখ উপভোগ করছেন।

মুখে সিরাজ যাই বলুক, মনে মনে সে অন্তত একজন বেগমকেও আশা করেছিল তার ঘরে। ভেবেছিল, এতদিন পরে ফিরে আসার আনন্দে অভিভূত হয়ে কোনো বেগম ঘরে ঢোকার আগেই ছুটতে ছুটতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু কেউ নেই। সিরাজের আশাহত দৃষ্টিতেও ফুটে উঠল সেই একই কথা—কেউ নেই। তার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে সে আমার কাছে ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু সামান্য জারিয়ার সামনে সে নিজেকে প্রকাশ করে না। তাই আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে। এত কথা তাকে কোনোদিন বলতে শুনিনি। দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল। মনে মনে বলি, যতই তুমি চালাক হও না কেন সিরাজ, আমি যে নারী। তোমার এত কথা কোন্ জিনিসকে চাপা দেবার জন্যে তা কি বুঝি না?

সিরাজ বলে, 'বুঝলে, এই মুর্শিদাবাদে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। যুদ্ধ করতে কষ্ট আছে ঠিক, কিন্তু আনন্দও আছে।'

'যুদ্ধটা তো সব সময়ের জন্য নয়, নবাবজাদা।' হঠাৎ সাহস পেয়ে যাই।

'নয় কেন?'

'বর্গীরা চিরদিন থাকবে না।'

'সাদা মুখগুলো আছে।'

'ওরা আর ক'জন?'

সিরাজ হেসে বলে, 'ওদেরকে কেউ চিনতে পারেনি। দাদু কিন্তু ঠিক চিনেছে। সামান্য ক'জন হলে কি হবে, ভীষণ শক্তি ওদের।'

'তবু আপনার কাছে কিছুই নয়। ইচ্ছে করলে ওদের দু'দিনেই তাড়িয়ে দিতে পারেন।'

'আমি!' সিরাজ অবাক হয়। বুঝতে পারি, তাকে এতখানি প্রাধান্য কেউ দেয়নি কখনো। তার বেগমরাও নয়। সে যেন এই প্রথম বুঝল যে, সে সাবালক।

'হ্যাঁ, আপনি নবাবজাদা।'

'দাদুই তো আছে।' তার কথা শেষ হয় না।

'তাঁর বয়স হয়েছে। এখন আপনার ওপরই ভরসা। আপনাদের কথা আমি সত্যিই লুকিয়ে শুনছিলাম। আপনার বীরত্বের কথাও শুনলাম।'

'ও!' সিরাজ অন্যমনস্ক হয়। সে আপন মনে ভেবে চলে।

'নবাবজাদা।'

'উঁ।'

'আপনার জুতো খুলে দিই। হাকিম আসবে যে।'

'ও, হ্যাঁ দাও।' সিরাজ তার পা বাড়িয়ে দেয়। বলিষ্ঠ পা, সুন্দর পরিপূর্ণ গড়ন, কোথাও খুঁত নেই। আস্তে আস্তে তার একখানা পা আমার কোলের ওপর তুলে নিই। দেরি করবো, যত খুশি দেরি করবো তার জুতো খুলতে। এইভাবেই আমার কোলের ওপর পড়ে থাক্ তার পা। এই ভারটুকু বহন করার জন্যেই বোধহয় এতদিন উদগ্রীব হয়েছিলাম।

হয়তো তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম। অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম। নইলে এতক্ষণে শুধু বাঁ পায়ের জুতো খোলা হবে কেন?

হঠাৎ সে চীৎকার করে ওঠে, 'আবার ওভাবে চেয়ে আছো? মানা করেছি না কত!'

কেন যে দুর্মতি হলো জানি না। বলে ফেললাম, 'ক্ষতি কি, নবাবজাদা?'

'এই দেখো ক্ষতি।' সে ডান পা দিয়ে আমার হাঁটুর ওপর আঘাত করে। অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে যাই। জুতোর নীচে লোহা আছে নিশ্চয়।

কিন্তু সিরাজের মুখের দিকে চেয়ে নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে যেতে হয়। সেও চীৎকার করে পালঙ্কের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

'কি হলো নবাবজাদা, কোথায় লাগল?'

'পা-টা আবার মুচকে গেল।' কাতরাতে কাতরাতে সে বলে।

তাড়াতাড়ি তার ডান পায়ের জুতো খুলে ফেলি। দেখি, গোড়ালির কাছে অনেকখানি ফুলে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কখন লেগেছিল হয়তো।

খালি পা আবার কোলে তুলে নিই। কি করবো ভেবে না পেয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিই।

কিছুক্ষণ পরে সিরাজ শান্ত হয়। সে বলে, 'তোমার কি খুব লেগেছিল?'

'না, নবাবজাদা।'

'একি, রক্ত এলো কোথা থেকে!' সিরাজ তার পায়ের গোড়ালির দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

'কই না তো?'

'এই যে! আমার পা তো কাটা ছিল না।'

নিজের হাঁটুর দিকে আমার নজর পড়ে। সেখানকার পোশাক রক্তে ভিজে উঠেছে। সিরাজের পদাঘাতের ফল।

'রক্তটা আমার নবাবজাদা।' শান্তভাবে বলি। অপরিসীম তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। আমার রক্ত নবাবজাদার পায়ে।

'তোমার কি করে হলো?'

আমি চুপ করে থাকি।

'ও, এত লেগেছে! কই দেখি?'

'না-না, থাক্। বেগম মহলে যদি এভাবে যুদ্ধ করতে পারেন, তাহলে মুর্শিদাবাদে থাকতে আপনার ইচ্ছে হবে, নবাবজাদা।

'কি বলছো!' সিরাজের চোখে বিস্ময়।

'যদি মুর্শিদাবাদে থাকেন, তাহলে প্রতিদিন এভাবে আমাকে পদাঘাত করে রক্ত দেখতে পারেন। আমি আনন্দের সঙ্গে সহ্য করবো। আপনারও যুদ্ধের সাধ মিটবে। মুর্শিদাবাদকেও আর একঘেয়ে বলে মনে হবে না।'

সিরাজ বিদ্যুৎগতিতে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে, হোসেন কুলিখাঁ যেখাবে ঘসেটি বেগমকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এত আনন্দ, এত শিহরণ এতে! বিহ্বল হয়ে পড়ি। বেগমসায়েবার হাত যেখানে লাগলে আমার ঘৃণা হতো, এখন কতবার সিরাজের হাত সেখানে লাগল। কই, ঘৃণা হচ্ছে না তো, আনন্দ হচ্ছে। অথচ সিরাজ পুরুষ।

'তুমি আমায় ভালোবাসো?' সিরাজ বলে।

'অপরাধ না নিলে হ্যাঁ।'

'চিরকাল বাসবে?'

'যতদিন বাঁচবো।'

'আমি মরার আগে তুমি মরো না।' সিরাজের স্বরে কাকুতি।

'আল্লা যেন আপনার কথা শোনেন, নবাবজাদা।'

'তোমার নাম কি?'

'তেমন নাম তো আমার নেই।'

'তোমার নাম লুৎফা—ভালোবাসা।'

'নবাবজাদার অশেষ দয়া।'

দূরের ফররাবাগের হাজার ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। সে-গন্ধ আমার মনকে মাতিয়ে তোলে। ফুলের গন্ধের সঙ্গে মনের এ সম্পর্ক আগে কখনো অনুভব করিনি। ঘরের ঝুলন্ত বাতিতে দিনের আলো পড়ে বিচিত্র বর্ণের দ্যুতি ঠিক্‌রে বার হচ্ছে। তারই নানান প্রকাশ চারিদিকের আরশিতে।

সিরাজ আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলে, 'তুমি এমন পোশাক পরো কেন?'

'আমাদের যে ভালো পোশাক পরতে নেই নবাবজাদা।'

'কেন?'

'আমি যে জারিয়া।'

'কে বললো তুমি জারিয়া? তুমি আমার বেগম। আজই মসলিন আনিয়ে দিচ্ছি তোমার জন্যে।'

সোফিয়ার কথা মনে হলো। কষ্ট হলো তার জন্যে। তার বেগম হবার শখ। রঙটা ময়লা না হলে

আজ আমার জায়গায় হয়তো সে থাকতো। কিন্তু সিরাজ কি রঙে ভুলল? রঙ তো অনেক দেখেছে সে। আমার চেয়েও রূপসী বেগম তার রয়েছে। সিরাজ যদি রঙে ভুলে থাকে, তাহলে আজ আমিই সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হলাম।

পরদিন বেগমসায়েবা ডেকে পাঠালেন। ভয়ে ভয়ে যাই। কারণ তিনি কোনদিনই ডেকে পাঠান না। ডেকে পাঠাবার অর্থ তাই এখানে খুব সুস্পষ্ট। বেগমসায়েবা সম্ভবত জারিয়ার ধৃষ্টতার জন্যে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছেন। ভবিষ্যৎ নবাবকে ছলনা করেছি বলে আমার শাস্তি। কিন্তু আল্লা তো জানেন, ছলনা আমি করিনি। সিরাজ যদি আজ বলে, তার দুর্বল মুহূর্তে কৌশলে তার মুখ দিয়ে বেগম হবার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছি, তাহলে মরতেও আপত্তি নেই, সে-মৃত্যু যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন? কিন্তু সে কি সে-কথা বলতে পারে? কাল তার চোখ-মুখ দেখে তো সে রকম মনে হয়নি।

ধীরে ধীরে বেগমসায়েবার ঘরে প্রবেশ করি।

'এই যে লুৎফা, এসো।' তাঁর আহ্বান আমাকে নাড়া দেয়। এ নাম তিনি কি করে জানলেন? সিরাজের দেওয়া নাম সে ছাড়া তো আর কেউ জানে না। কেউ শোনেওনি। তবে কি সত্যিই সে সব কিছু বলে দিয়েছে? বেগমসায়েবা কি বিদ্রূপ করছেন? দুরাশাকে মনে স্থান দিয়েছি বলে ব্যঙ্গ করছেন? একদিনের বেগমগিরি আজই তিনি খতম করবেন?

আমার গতি থেমে যায়। মাথাটা আপনা হতে নুয়ে আসে।

'ওকি, থামলে কেন? আমার সিরাজের বেগমসায়েবাকে যে দেখতে সাধ হয়েছে। কাছে এসো, চোখ ভরে দেখি।'

মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। কী কুক্ষণে যে কাল আড়ি পেতেছিলাম। অমন দুঃসাহস কেন যে হয়েছিল? সোফিয়ার মুখ দেখে ওঠার ফল যে এত সুদূরপ্রসারী হতে পারে কল্পনা করিনি। আমি কেঁদে ফেলি।

'ওকি! ছিঃ, কাঁদছো কেন লুৎফা? কাছে এসো, তোমাকে একটু ভালো করে দেখবো যে। এমন দিনে কি কাঁদতে হয়?'

এ স্বর তো ঠাট্টা-বিদ্রূপের নয়। এতে যে সত্যিই আগ্রহ আর মমতা মাখানো। ধীরে ধীরে চোখ তুলি। চোখের জলে বেগমসায়েবার মুখ ঝাপসা দেখা যায়। ওড়না দিয়ে জল মুছে ফেলি। দেখি, বেগমসায়েবা অধীর আগ্রহে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।

তাঁর কাছে গেলে তিনি পালঙ্কের একপাশে বসতে বলেন। এতখানি সম্মান জারিয়াকে তিনি কখনো দেন না। ঠাট্টা করেও নয়। বুঝলাম, আমার জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ আজ। আমি সত্যিই বেগম।

বেগমসায়েবার পাশে এসে বসি।

'এতদনে সত্যিই বড় হয়েছো তাহলে?' তিনি আমাকে দু' বাহু দিয়ে বেষ্টন করেন।

ভীষণ লজ্জিত হই। বেগমসায়েবার দিকে চাইতে পারি না।

'অত লজ্জা কেন? সিরাজের বেগমের সঙ্গে একটু তামাশাও করতে পারবো না? তবে কার সঙ্গে করবো? সিরাজ যে আমার নাতি।'

সাহস হলো তাঁর কথায়। বললাম, 'এ রকম ঠাট্টা তো আগেও করতেন বেগমসায়েবা।'

'আগে থেকে যে জানতাম, তুমি সিরাজের বেগম।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ লুৎফা, হারেমে বেগম অনেক দেখেছি। সিরাজের তো এমন বেগম হলে চলবে না। তার

এমন একজন দরকার, যে তার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকবে, নইলে সিরাজের যে মঙ্গল নেই। ও বড় জেদী, বড় দুঃসাহসী, বড় অবুঝ। তুমি ওর ভার নাও। হারেমের বেগমের মতো করে নয়, ওর জীবনের সঙ্গে তুমি মিশে এক হয়ে যাও।' বেগমসায়েবার গলা ভারী হয়ে ওঠে। চোখ দুটো চকচক করে।

আনন্দে আমার মনের দু'-কুল প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল। বললাম, 'তাই হবে বেগমসায়েবা। আমিও হারেমের বেগম হতে চাই না।'

'লোক চিনতে আমার ভুল হয় না, লুৎফা। আমি তোমাকে চিনি।'

আজ বুঝলাম, কেন তাঁর আমার ওপর অহেতুক পক্ষপাতিত্ব ছিল। আমার রূপের জন্যে নয়, আমার বয়সের জন্যেও নয়। আগে থেকেই আমি তাঁর আদুরে নাতির বেগম হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। তাই তাঁর নিজের কক্ষের আশেপাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেও তিনি কোনোদিন কিছু বলেননি।

'সিরাজ যে তোমাকে চিনে নিতে পেরেছে, এতেই আজ আমার সব চাইতে বেশি আনন্দ। আমি বললে সে হয়তো শুনতো না। তাকে যা বলা হয়, করে ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এখন বুঝলাম, সেও মানুষ চেনে।'

আমার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দিষ্ট হলো। সেখানে গিয়ে দেখি, থরে থরে সাজানো রয়েছে বহুমূল্য পোশাক। এতদিনের জারিয়ার বেশ ছেড়ে ফেলি। সিরাজের পছন্দ হতে পারে এমন একটা পরিচ্ছদ বেছে নিয়ে পরি। আনন্দে কক্ষের চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। আরশির সামনে নানাভাবে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ যাচাই করি। মেহেন্দি রঙে আঙুল রাঙিয়ে তুলি। চোখে এঁকে দিই সুর্মা।

কে বলে আমি জারিয়া! নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু আমি যে বড় ছোট। হোসেন কুলিখাঁ ঠিকই বলেছিলেন, আমি ছোট। বেগমসায়েবাও যখন-তখন সে-কথা বলতেন। এখনো হয়তো মনে মনে বলেন।

দরজার কাছে এগিয়ে যাই। উঁকি দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি, আশপাশে কেউ আছে কিনা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সমস্ত পোশাক খুলে ফেলি। আরশির ভেতরে আমার প্রতিবিম্বের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকি। আমি ছোট, সত্যিই ছোট। আমি হামিদার মতো নই। আমি ঘসেটির মতো নই। এমনকি সোফিয়ার মতোও আমি নই।

কি করে তাড়াতাড়ি বড় হবো কে বলে দেবে? সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করবো কি? কিন্তু সে যদি বিদ্রূপ করে? তার চোখের সামনে বেগম হয়েছি বলে মনে মনে সে নিশ্চয়ই আমাকে হিংসে করবে। যদি এমন কোনো পথ বলে দেয় যাতে আমার ক্ষতি হয়? কিন্তু সে তো এখনো জানে না। প্রাসাদের কেউই জানে না।

মনে মনে ভয় হয়, আমি ছোট বলে সিরাজ হয়তো আমাকে অবহেলা করবে। পরিত্যাগও করতে পারে।

শেষে সোফিয়ার কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।

কিন্তু তার কাছে যেতে হলে জারিয়া সেজে যেতে হবে। ঘরের একপাশে ছেড়ে রাখা পোশাক পড়ে রয়েছে। সেগুলো তুলে নিলাম। বড় তুচ্ছ বলে এখন মনে হয় এ পোশাককে। পরতে ইচ্ছে হয় না, তবু পরতে হবে। নিজের স্বার্থের জন্যে আবার জারিয়া সাজাতে হবে।

দরজায় ধাক্কা শুনি, সিরাজ এসেছে বোধহয়। জারিয়ার পোশাক একপাশে লুকিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি আবার নতুন পরিচ্ছদ পরে নিই।

দরজা খুলি।

ঘসেটি বেগম দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য, ঠিক আমারই পোশাকের মতো রঙের মসলিনে তার অঙ্গ আবৃত।

আমার দিকে চেয়ে তার চোখ জ্বলে ওঠে। আমি মনে মনে হাসি। এতদিনের অত্যাচারের উচিত প্রতিফল পাবে সে। সে জানে না, আমি সিরাজের বেগম। তার মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। চীৎকার করে, 'বেগম সাজার শখ হয়েছে? লুকিয়ে লুকিয়ে বেগম সাজা হচ্ছে?' চপেটাঘাত করে সে আমার গালে।

গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেলেও কিছু বলি না তাকে। দেখা যাক্ আজ কতদূর ওঠে। এতদিন ঘরখানা মাঝে মাঝে ঘসেটিই ব্যবহার করতো। কেন ব্যবহার করতো, সে খবরও জানতে আর বাকি নেই। ঘরখানা একটু নিরিবিলিতে বলে সে হোসেন কুলিখাঁর সেবা করতো এখানে। সোফিয়া নিজে আমাকে বলেছে সেদিন।

'কি করছিলি এখানে?'

'একটু সাজগোজ করছিলাম।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার পোশাক কেন পরেছিস্? এত স্পর্ধা?' আর এক চপেটাঘাত।

বুঝলাম, সহজে ছাড়বে না। আমার মাথায় আগুন জ্বলছিল, তবু সহ্য করলাম। যদি লাথি দিতে আসে পালাতে হবে। নইলে বেগমগিরি আমার আজই শেষ হবে।

ঘরের রাশিকৃত পরিচ্ছদ দেখিয়ে বলি, 'ওগুলো সবই কি আপনার বেগমসায়েবা?'

বিস্মিত হয়ে ঘসেটি ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে সব নাড়াচাড়া করে। আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলে। তারপর আমাকে প্রশ্ন করে, 'এসব কোথা থেকে পেলি?'

'সব বেগমের ঘর থেকে একখানা করে চেয়ে এনেছি।'

'তারা দিলে?'

'দেবে না কেন? আমাকে সবাই স্নেহ করেন যে।'

ঘসেটি যেন বোবা হয়ে যায়। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। আমার গাল জ্বলে যাচ্ছিল, বোধহয় রক্ত ফুটে বার হচ্ছে। তবু ঘসেটির মুখ দেখে কৌতুক অনুভব করছিলাম।

হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কিন্তু আমার এই ঘরে কেন এসেছিস?'

'এ ঘর আপনার? তা তো জানা ছিল না। আমি জানতাম, দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরখানাই আপনার।'

'তর্ক হচ্ছে? আমার সঙ্গে তর্ক? দূর হয়ে যা এখান থেকে।' সে এসে আমার চুল চেপে ধরে।

'যাচ্ছি বেগমসায়েবা! হোসেন কুলিখাঁ কি আবার এসেছেন?'

'কি বললি?'

'বলছি হোসেন কুলিখাঁ কি ঢাকা থেকে আবার মুর্শিদাবাদে এসেছেন?'

ঘসেটি থ' হয়ে যায়। কি বলবে ভেবে পায় না। তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন আমাকে সে গিলে খাবে।

আমি বলি, 'অমন করে তাকাবেন না বেগমসাযেবা, ভীষণ ভয় পাই আমি। কিন্তু এমন ঘন ঘন যাতায়াতে অর্থেরই অপচয় হয়, কোনো কাজ হয় না।'

এবারে ঘসেটি উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বুঝলাম, পালাতে না পারলে এখানেই আমার জীবন শেষ। সে যেভাবে আমার মাথার চুল ধরে রয়েছে, ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বেশিক্ষণ দেরি করাও উচিত নয়।

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সুড়সুড়িতে ঘসেটির বড্ড ভয় আছে বলে জানি। বাঁ হাত দিয়ে তাকে সুড়সুড়ি দিই।

ছিটকে দূরে সরে যায় সে। একমুহূর্ত বিলম্ব না করে বেগমসায়েবার ঘরের দিকে ছুটতে থাকি।

তিনি ছাড়া আমাকে রক্ষা করার দ্বিতীয় কোনো লোক নেই এখন। আর একজন যে পারে সে এখনো নবাব মহলের বাইরে রয়েছে। বাইরে না থাকলে এতক্ষণে অন্তত আমার কাছে একবার আসতো।

ঘসেটি আমার পেছনে পেছনে বেগমসায়েবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সে ফেটে পড়ে। বলে, 'অনুগ্রহ দেখিয়ে জারিয়াদের মাথায় তুলেছো তুমি। পায়ের তলায় না রাখলে ওরা কখনো ঠিক থাকে? এদের কিভাবে সিধে রাখতে হয় আজ তোমাকে দেখাবো। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের বেগম হয়েও এতদিনে এটুকু শিখলে না? কি করেই বা শিখবে! সাধারণ লোকের বিবি ছিলে, হঠাৎ বেগম হয়েছো তো।'

'বাজে কথা থাক্। কি হয়েছে বলো?'

'কি হয়েছে? ওর দিকে চেয়ে দেখো কেমন অপ্সরী সেজেছে।'

'ও অপ্সরী সাজায় তোমার কি এসে যায়?'

'তা তো বলবেই। দাসী-বাঁদী সব বেগম সেজে বসে থাকবে। চমৎকার, এই না হলে বাংলার বেগম।'

'উপদেশ দিও না ঘসেটি।' বেগমসায়েবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে বোঝা গেল।

'তোমার পেয়ারের জারিয়া আমার গায়ে হাত তুলেছে।'

'সত্যি লুৎফা?'

'না বেগমসায়েবা, ওঁকে সুড়সুড়ি দিয়ে পালিয়ে এসেছি। নইলে উনি আমাকে মেরে ফেলতেন।'

'কেন?'

'উনি আমার ঘরে গিয়ে আমাকে দূর হয়ে যেতে বলেন। আমি কেন তা যাবো? তাতেই ওঁর রাগ।' হোসেন কুলিখাঁর কথা ইচ্ছে করেই উল্লেখ করলাম না। বিপদে পড়লে সেটাকে শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্যে তুলে রাখলাম।

'তাই নাকি! আর তুমি তা সহ্য করলে লুৎফা? কাউকে হুকুম করলে না কেন, যাতে ঘসেটিকে বার করে দেয় ঘর থেকে।' বেগমসায়েবা রীতিমতো উত্তেজিত।

'তুমি বলছো কি মা?' ঘসেটির চোখ বিস্ফারিত।

'ঠিকই বলছি। ভবিষ্যৎ বাংলার বেগমের ঘরে ঢোকা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা। লুৎফা তোমাকে অপমান না করে দয়া দেখিয়েছে।'

ঘসেটির মুখের অবস্থা দেখে আমারই লজ্জা হলো। সে কি করবে, কি বলবে, কিছুই বুঝতে পারে না। কেমন যেন একটা অসহায় ভাব। আমি গিয়ে তার হাত ধরি।

'থাক্! ঢের হয়েছে, ছেড়ে দাও।' সে ঝট্‌কা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'একটা কথা বলি মা, ভবিষ্যৎ বাংলার নবাব এত সহজে ঠিক হয় না।'

'ঘসেটি।' বেগমসায়েবা অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন।

'তোমার ধমকে বাংলাদেশ কাঁপতে পারে, কিন্তু ঘসেটি কাঁপবে না।'

তার ঔদ্ধত্যে আমার রাগ হয়। বলি, 'বেগমসায়েবার ধমকে না কাঁপতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাকে কাঁপিয়ে ছেড়ে দিতে পারি ঘসেটি বেগম।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায়।

বেগমসায়েবা আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, 'ব্যাপার কি লুৎফা? তোমার কথায় ও এমনভাবে পালিয়ে গেল কেন?'

'আজ আমাকে কিছু বলতে আদেশ করবেন না, বেগমসায়েবা। যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় আমি নিজে থেকেই বলবো।'

'বেশ, তাই বলবে।'

বেগম হয়েছি বলে আমার প্রিয় গবাক্ষ পরিত্যাগ করিনি। বেগম হয়ে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকা আমার ধাতে নেই। তাই দিনের মধ্যে কতবার যে মহলের নির্জন স্থানে গিয়ে দাঁড়াই তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সিরাজ আবার যুদ্ধে গিয়েছে। এবারে বর্গীদের একেবারে শেষ করে আসবেন প্রতিজ্ঞা করে নবাব যাত্রা করেছেন তাঁর নাতিকে সঙ্গে নিয়ে।

বর্গীদের দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়েছে। জগৎ শেঠের মধুগড়ের অগাধ জলরাশি না থাকলে বাংলার ধনদৌলত রক্ষা পেতো না। নবাবের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে বর্গীরা কাশিমবাজার অবধি চলে এসেছিল। মধুগড়ের জলের মধ্যে ফেলা হলো দেশের যত মণিমুক্তা হীরে জহরত আর সোনাদানা। তাতে নিঃস্ব হলো না বাঙালী বণিকেরা। তবু শোনা যায়, অনেকের ধনরত্ন আর উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না, অতল জলরাশির কোথায় গিয়ে যে লুকিয়েছে তার হদিশ নেই।

বর্গীরা যে একেবারে খালি হাতে ফিরে গিয়েছে তাও নয়। সামনে যা কিছু পেয়েছে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

সিরাজ নেই। শূন্য মনে দাঁড়িয়ে আছি। চেয়ে থাকি দূরে এমতাজমহলের গম্বুজের চূড়ার অস্তমিত সূর্যের রক্তবর্ণ রশ্মির দিকে।

হঠাৎ নীচে বাগিচার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। চামেলি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সোফিয়া আর মহম্মদের প্রেমালাপ চলেছে।

সোফিয়া বেগম হবার দুরাশা ছেড়েছে দেখছি। বেচারা!

নিরাশ্রয় মহম্মদকে বেগমসায়েবাই আশ্রয় দিয়েছেন। লোকটিকে আমার ভালো লাগে না। স্পষ্ট করে বলতে গেলে তাকে দেখে আমার ভয় হয়। কেমন একটা ক্রূর দৃষ্টি তার চোখে। কেন যে বেগমসায়েবা একে আশ্রয় দিয়েছেন জানি না।

সোফিয়া শেষে মহম্মদকে হৃদয় দিল, আর লোক পেল না? বেগমসায়েবাকে বলতে হবে সব ঘটনা। দু'জনার শাদি দিয়ে দেবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শাদি হলে আর তারা মহলে থাকতে পারবে না। সোফিয়ার জন্য একটু কষ্ট হবে, কিন্তু মহম্মদ তো বিদায় নেবে। সিরাজ মহম্মদকে বড় বেশি পছন্দ করে। সে অসন্তুষ্ট হবে ভেবে আমি কিছু বলতে পারি না। হয়তো ভাববে, তার সব ব্যাপারেই নাক গলাতে চেষ্টা করি।

সিরাজের কোনো দোষ নেই। সে তোষামোদ পছন্দ করে। তোষামোদের ক্ষমতা মহম্মদের অদ্ভুত। অমন যে কর্কশ স্বভাব, কিন্তু বেগমসায়েবা আর সিরাজের কাছে একেবারে ভিজে বেড়ালটি। কেমন গলে পড়া ভাব। যে মানুষ এত সহজে তার ভোল পাল্টাতে পারে, সে কখনো ভালো হয় না, হতে পারে না।

সন্ধে হয়ে আসে। এমতাজমহলের গম্বুজ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। মহলের চারিদিকে বাতি জ্বলে উঠেছে। নিজের ঘরে ফিরে যাবো। নরম বিছানার ওপর গা এলিয়ে দেবো এখন।

সিরাজ এ সময় হয়তো যুদ্ধ করছে। কিংবা শিবিরের মধ্যে বসে দাদুর সঙ্গে সারা দিনের যুদ্ধ সম্বন্ধে তার আলোচনা চলছে। কিংবা বোধহয় আহত, কিংবা....

আমার সারা দেহ শিউরে ওঠে। এমন অশুভ চিন্তা মাথায় আসে কেন? বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো গৌরবের। যুদ্ধ করে দেশের শত্রুকে বিতাড়িত করবে, প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে জীবনপণ করবে, তবেই তো আদর্শ নবাব। তবে কেন নানা আশঙ্কায়

মনটা ভরে ওঠে? যত ভাবি কোনো চিন্তা করবো না, ততই যেন হাজার চিন্তা এসে মাথার মধ্যে জট পাকায়।

একা থাকবো না। তার চেয়ে কোনো জারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে যাই। তার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলে সময় কাটাই। এখন তারা আর আমায় অবহেলা করে না। আমাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে তাদের মধ্যে এখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। ঘসেটির প্রতিপত্তি এই কয়দিনেই অনেকটা কমে গিয়েছে।

'বেগমসায়েবা।'

পেছন ফিরে দেখি হামিদা দাঁড়িয়ে।

'কি হামিদা?'

'ঘসেটি বেগমের ঘরে যাবার কি সময় হবে আপনার?'

'তিনি ডাকছেন?'

হামিদা ঘাড় নাড়ে।

'চলো।'

ঘসেটি ছুটে এসে আমার হাত ধরে অভ্যর্থনা জানায়। বুঝলাম, সে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কেন? তার এ পরিবর্তন একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

'ঘরে এসো লুৎফা। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি বলে কিছু মনে করোনি তো?'

'না।' জবাবটা সংক্ষিপ্ত। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারলাম না। কারণ, মনের মধ্যে তখন হাজার জিজ্ঞাসা।

পালঙ্কের ওপর বসিয়ে ঘসেটি নিজের হাতে একপাত্র শরবত এনে দেয়। এতটা সৌজন্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাড়াতাড়ি হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে বলি. 'কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন?'

'গরম পড়েছে, তাই ওটুকু তোমার জন্য আনিয়েছি।'

'শরবত আমি খাই না।' ঘসেটির পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়। পানীয়ের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

'তবে থাক্।' তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। সে অপমানিত বোধ করছে। দু'দিন আগে যে সবচেয়ে অবহেলিত একজন ক্রীতদাসী মাত্র ছিল, আজ সিরাজের অনুগ্রহে সে ঘসেটিকে নিজের হাতে দেওয়া শরবত পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে, একি কম বেয়াদবি!

'আমাকে কেন ডাকছিলেন?' শরবতের পাত্রটা একপাশে রেখে বলি।

'এমনি, গল্প করার জন্যে। তোমার কি সময় নেই?'

'আছে।' মনে মনে ভাবি, শুধু গল্প করার জন্যে ডেকে আনার পাত্রী তুমি তো নয়। নিশ্চয়ই কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, তবে সে উদ্দেশ্য সহসা প্রকাশ করবে না ঘসেটি। ধীরে ধীরে ভাঙবে। আমি অপেক্ষা করি।

সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিজের গলা থেকে একটা বহুমূল্য মুক্তার মালা খুলে নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দেয়।

'একি করলেন!' আমি আপত্তি করি।

'তোমায় দিলাম। সিরাজ আমার স্নেহের পাত্র লুৎফা। তোমাকে তাই স্নেহ করি। সেদিন তোমার পরিচয় পাইনি, তাই অমন ব্যবহার করেছিলাম। কিছু মনে কোরো না।'

'আমি কিছু মনে করিনি, বেগমসায়েবা।'

'সে তোমার মহত্ত্ব। এই মালা তোমার প্রতি আমার স্নেহের নিশানী হয়ে থাক্।'

'বেগমসায়েবার অশেষ দয়া।' মুখে বললেও মনে মনে দস্তুরমতো চঞ্চল হয়ে উঠি। ভাবি, কতক্ষণে উঠতে পারবো।

ঘসেটি অনেক কথাই বলে চলে। বুঝতে কষ্ট হয় না, সব কিছুর উদ্দেশ্য একটাই, আমাকে তোয়াজ করা। ছোট ছোট কথায় আমিও সাধ্যমত জবাব দিয়ে যাই।

'সেদিন তুমি ওকথা বললে কেন লুৎফা? আমার মনে বড় লেগেছে।'

বুঝতে পারি এতক্ষণে আসল কথায় আসছে।

'কি কথা?' অবাক হবার ভান করি।

'বেগমসায়েবাকে আপনি ওভাবে বললেন বলে আমার রাগ হয়েছিল। সেজন্যে আজ ক্ষমা চাইছি।'

'না-না, ক্ষমা কেন? কাঁপাতে তো পারোই আমাকে। ভবিষ্যৎ বাংলার খাস বেগমের সেটুকু ক্ষমতা থাকবে না!'

'অত ভেবে বলিনি।'

'তবে কেন বলেছিলে?'

কথার প্যাঁচে হাঁপিয়ে উঠি। স্পষ্ট করে বলাই স্থির করলাম। ঘসেটির ঘরে যেন বাতাস বয় না। পুঞ্জীভূত পাপ আর অনাচার বহুকাল ধরে বাসা বেঁধে এ ঘরের বাতাসকে দূষিত করে দিয়েছে। তার সুন্দর মুখেও অনাচারের ছাপ। তার ছন্দায়িত দেহে উচ্ছৃঙ্খলতার শ্লথতা।

বলি, 'হোসেন কুলিখাঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি তা আমার অজানা নয়, বেগমসায়েবা। আমার চোখই আমার সাক্ষী। যেদিন আপনাকে মহলের সেই নির্জন জায়গায় গড়াগড়ি যেতে দেখে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম, সেদিন দু'হাত দূরের এক অন্ধকার কোণ থেকেই সবই দেখেছিলাম। কাউকে একথা বলিনি, বলবো না। কিন্তু আপনাকে এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, সিরাজের অমঙ্গল চিন্তা আপনি করবেন না।'

ঘসেটির মুখ সাদা হয়ে যায়। সে ভেতরে ভেতরে ভীত হয়ে পড়ে। আমার হাত দুটো তার দু'হাতে তুলে নিয়ে বলে, 'বেশ, তাই হবে।'

বর্গী-সেনাপতি এতদিনে নিহত হয়েছে। কৌশলে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কোন্ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, সে-কথা নবাব বললেন না। বেগমসায়েবার শত অনুরোধেও তিনি চুপ করে থাকলেন। তাঁর মুখ ব্যথায় থম্‌থম্ করে। যুদ্ধ জয় করেও জয়ের আনন্দ নেই মুখে। প্রতিবার যুদ্ধের পর এসে পুরো একটা দিন বেগমসায়েবার সঙ্গে অতিবাহিত করেন তিনি। এবারে ফিরে এসে সোজাসুজি চেহেন-সেতুনে চলে যান।

বেগমসায়েবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'সিরাজকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবে লুৎফা?'

'আমি জিজ্ঞাসা করেছি, বেগমসায়েবা। তিনিও কিছু বললেন না।'

'ও, তুমি জানো দেখছি।' তিনি চিন্তায় ডুবে যান।

নবাব আলিবর্দির এমন পরিবর্তন নাকি বহুদিন হয়নি। বেগমসায়েবা বললেন, 'গিরিয়ার যুদ্ধের পর যখন তিনি মসনদ দখল করেন, তখন একবার এমন হয়েছিল। সরফরাজ ছিলেন ওঁর প্রভু। তাঁর অধীনে উনি সামান্য একজন কর্মচারী ছিলেন মাত্র। তাই প্রজাদের সমর্থন পেয়েও প্রভু হত্যার 'অপরাধবোধ' ওর ঘাড়ে ভূতের বোঝার মতো বহুদিন চেপেছিল। আমি অনেক বুঝিয়ে সে বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়েছিলাম।

নবাব আলিবর্দি খুব ধর্মভীরু। তাই বর্গী-সেনাপতিকে হত্যা করে আবার আগের মতো তিনি মন-মরা হয়ে পড়েছেন।

সিরাজও কিছু বলতে অস্বীকার করেছে শুনে বেগমসায়েবা একেবারে ভেঙে পড়েন। আতঙ্কগ্রস্ত হন তিনি।

'সিরাজও তার দাদুর রোগ পেয়েছে। এ ভালো নয়, লুৎফা। ওকে তুমি শক্ত করে তোলো। এই বয়সে অমন ভাবপ্রবণ হলে তো চলবে না।'

'আমি চেষ্টা করবো, বেগমসায়েবা।'

'শুধু চেষ্টা নয়, এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।'

'আচ্ছা।' মুখে তাঁর কথায় সায় দিলেও মনে মনে আমি সিরাজকেই সমর্থন করি। যুদ্ধে মানুষ মারা এক কথা, কিন্তু হীন ষড়যন্ত্রকে আমিও যে ঘৃণা করি। কি করে সিরাজকে আমি শক্ত করবো? তার চেয়ে সে নবাব আলিবর্দির মতো উপযুক্ত হোক। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, দাদুর রোগই যেন সিরাজ পায়। এ রোগ যার আছে সেই তো প্রকৃত বীর। আলিবর্দি বীর বলেই তাঁর মুখ আজ এত বিষণ্ণ।

বর্গীদের মাজা ভেঙে দিয়েও তাঁর মনে আজ বিন্দুমাত্র আনন্দ নেই। সিরাজও যেন অমন হয়। নইলে আল্লা নিজেই যে লানত করবেন তাকে। তিনি তো অন্যায় অবিচার সহ্য করেন না।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দেখি সিরাজ সেখানে বসে রয়েছে। তার স্বাভাবিক স্ফূর্তিভাব নেই। কাছে এগিয়ে গেলেও সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল না। আমার মুখের দিকে কেমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

'কি হলো তোমার?'

'না, কিছু না।' ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিত হয়েছে। একে পুরুষ মানুষ, তার ওপর নবাবের উত্তরাধিকারী। তার কি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া উচিত? নিজের বেগমের সামনেও নয়। তবু মাঝে মাঝে তার মনকে অরক্ষিত অবস্থায় এনে আমার কাছে হাজির করে। তাতেই আমার সুখ, আনন্দ। সে নবাবজাদা হয়ে আমার কাছে আসে না। আসে সিরাজ হয়ে—শুধু সিরাজ।

'তোমার সেই সহচরটি কোথায়?' প্রশ্ন করি আমি।

'কার কথা বলছো?'

'মহম্মদ।'

'সহচরই বটে! কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ে না। তাড়িয়ে তো দিতে পারি না। একটু ধমক দিলেই চোখ ছলছল করে ওঠে।'

'কুমীরের অশ্রু।' অস্ফুট স্বরে বলি।

'কি বলছো?'

'না, কিছু না। তোমাকে বড় মন-মরা দেখাচ্ছে।'

'কই, না তো!'

'মন-মরা হওয়াই স্বাভাবিক। তুমি বীর, তাই এমন হয়েছে।'

'কি বললে লুৎফা?' সে আমার কথায় চমকে ওঠে।

'বর্গী সেনাপতিকে কৌশলে হত্যা করে তুমি আর তোমার দাদু দু'জনেই কষ্ট পাচ্ছো। কষ্ট তো পাবেই। শত অন্যায় করলেও সে বীর ছিল। বীরকে যুদ্ধে আহ্বান করে হত্যা করাই উচিত ছিল।' একটু থেমে ভেবে নিয়ে আবার বলি, 'কিন্তু এতে তো তোমার হাত নেই, নবাবজাদা। নবাবের হাত কিছুটা ছিল, তার জন্যে তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত। অবশ্য তোমার মন খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এখন তোমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সময়। নিজে যখন ক্ষমতা পাবে তখন যাতে এমন না হয় তাই দেখো।'

সিরাজ ছুটে এসে আমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করে। একেবারে পাগল, সেইজন্যেই

তো এত ভালোবাসি।

'তুমি আমার লুৎফাউন্নেসা। তুমি না হলে এভাবে কে আমাকে সান্ত্বনা দিত!'

'এবার নামিয়ে দাও। হাত ফস্‌কে গেলে ভবিষ্যতে কে সান্ত্বনা দেবে?'

'আমার হাত থেকে পড়ে যাবে?'

'কেন, তোমার হাত থেকে কি কেউ পড়ে না?'

'না, দেখবে?' সিরাজ তার কাবা-চাপকান সব খুলে ফেলে। খালি গায়ে শুধু একটা অন্তর্বাস পরে দাঁড়ায়। এভাবে সিরাজকে এই প্রথম দেখলাম। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। কী সুন্দর! বলিষ্ঠ দেহের স্থানে স্থানে ক্ষতচিহ্ন এক বীরত্বব্যঞ্জক সুষমা দান করেছে তাকে।

'কি দেখছো অমন করে?' সিরাজ বলে।

'তোমাকে।'

'ও! আর দেখো না, ফুরিয়ে যাবো।' সিরাজ হেসে তার পোশাক পরে ফেলে।

'এবারে বিশ্বাস হলো লুৎফা যে, আমার হাত থেকে কেউ ফসকে যায় না।'

'হুঁ।' তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। সিরাজের ক্ষণপূর্বের বিষণ্ণমুখে এখন যে আনন্দের জোয়ার এসেছে এ তো আমারই দান।

মহম্মদের সঙ্গে সোফিয়ার শাদি হয়ে গেল। নবাব মহল থেকে তারা বিদায় নিয়ে অদূরে এক জায়গায় বাসা বাঁধল।

সোফিয়া তবু মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যায়। আমিই তাকে আসতে বলেছিলাম। মহলের বাইরে কিছু খবর জানার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। শুনতে পাওয়া যায়, সিরাজের সহচরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুনে বড় ভয় হয়। সে সরল বলেই আমার এত ভয়। খারাপ সহচরের হাতে পড়লে খারাপ হতে তার বেশি সময় লাগবে না। সে যে বাংলার পরবর্তী নবাব, এ বিষয়ে বড় বেশি সচেতন সে। তাই সেইরকম মর্যাদা দেখিয়ে তাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেওয়া সম্ভব। তার তোষামোদকারীরা হয়তো সেই সুযোগই নিচ্ছে।

সোফিয়া একদিন এসে মেহেদি নেশার খাঁ নামে একজনের কথা বললো। তার নামে সে অনেক কিছু বলে গেল। শুধু তার নামে নয়, আভাসে সিরাজের সম্বন্ধেও এমন কতকগুলি কথা বললো, যা কখনো কল্পনা করিনি। এ কথাও বুঝলাম, মেহেদি নেশার খাঁ যেই হোক না কেন, তোষামোদের ব্যাপারে মহম্মদের চেয়েও শক্তিমান। মহম্মদকে সে কোণঠাসা করেছে বলেই সোফিয়ার সব আক্রোশ তার ওপর।

প্রস্তুত হই। সিরাজকে সামলাতে হবে। নবাব বংশের চিরাচরিত দোষগুলি তার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। এখন সাবধান না হলে পরে আমাকেই আপশোষ করতে হবে। শরাব সে কোনোদিন পান করতো না। আজকাল তার মুখে গন্ধ পাই। ভেবেছিলাম, শখ করে মাঝে মাঝে একটু আধটু খায়। কিন্তু সোফিয়ার কথা শুনে বুঝলাম, ভালো রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে সিরাজের।

কতটুকুইবা ক্ষমতা আমার? হারেমে বসে কি করে সামলাবো? অস্থির হয়ে উঠি।

শুধু শরাব হলেও কথা ছিল। হারেমে তো বেগমের অভাব নেই। তবে কেন বাইরের দিকে নজর পড়ল সিরাজের। তার সরল মুখের দিকে চেয়ে কখনো তো মনে হয় না যে, সে অমন হবে। কুসংসর্গ এভাবে তাকে দিনের পর দিন নীচে টেনে নিয়ে যাবে, আর আমি তাই অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখবো?

বেগমসায়েবাকে বলে লাভ নেই। তিনি কোনো গুরুত্বই দেবেন না। স্নেহের নাতিকে ছেলেবেলা থেকে সংযম শিক্ষা না দিয়ে তিনিই এমন করে তুলেছেন। এখন তাঁকে কিছু বললে তিনি তাঁর গাফিলতিকে ঢাকার জন্যে দু' পাঁচটা উপদেশ দিয়ে বসবেন। এ আমার অনুমান নয়। আর একদিন

সামান্য একটা কথা বলতে গিয়ে আমি বুঝে ফেলেছি। অথচ তিনিই আমাকে তাঁর নাতির ভার দিয়েছিলেন সার্থক নবাব করে তুলতে।

তাই যা-কিছু করার আমাকেই করতে হবে। না পারলে নিজেকেই মাথা কুটতে হবে। কেউ সহায়তা করবে না।

সিরাজকে স্পষ্টভাবে বলতে পারি, কিন্তু তাতে ফল অন্যরকম হবে। তাকে বাধা দেবার সামান্য চেষ্টা করলে সে আরও দুর্দান্ত হয়ে উঠবে। কারণ, জীবনে সে কোনো কাজে বাধা পায়নি। রয়ে-সয়ে ভেবে-চিন্তে কিছু করতে না পারলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

সিরাজের কথা ভেবে সে সময় নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করছি, সে সময় হঠাৎ এক নিদারুণ দুঃসংবাদ সমস্ত নবাব-পরিবারকে ভেঙেচুরে দুমড়ে দিয়ে গেল। বেগমসায়েবা রুদ্ধ কক্ষে অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন। মহলের কারও মুখে হাসি নেই। নবাব আলিবর্দি হঠাৎ অতিমাত্রায় বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। শুধু ঘসেটি বেগমের ঘরে কখনো কখনো হাসির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন হত হয়েছেন। পাটনার আফগানেরা তাঁকে কৌশলে হত্যা করেছে। খবরটা মুর্শিদাবাদে পৌঁছানোর পর থেকেই মহলের এই অবস্থা।

সিরাজকে খুঁজে পাচ্ছি না। জানি না সে এখন কোথায় আছে। এ সময়ে তাকে আমার বড্ড প্রয়োজন। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পাগলের মতো একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো। এ সময় তাকে যদি সান্ত্বনা না দিতে পারি, তবে আমি কিসের বেগম? আমার লুৎফা নামই মিথ্যে।

খবর আসার পর দু'দিন কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় বেগমসায়েবা তাঁর দরজা খুললেন। জারিয়ারা ছুটে গেল তাঁর কাছে। ঘসেটি বেগমকেও যেতে দেখলাম সেদিকে। ভিড় দেখে আমি আর গেলাম না। ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

ঠিক সেই সময় সিরাজ এলো। শিথিল দেহখানা কোনোরকমে টানতে টানতে এনে পালঙ্কের ওপর ছড়িয়ে দিল। তার চোখ রক্তবর্ণ। ভাবলাম, শরাব পান করে এসেছে। হয়তো পিতার মৃত্যুসংবাদ শোনবারও অবসর হয়নি তার।

ভীষণ রাগ হলো। প্রশ্ন করি, 'কোথায় ছিলে দু'দিন?' জবাব পাই না।

'আমার কথা শুনতে পেয়েছো?'

'পেয়েছি লুৎফা।' অবসন্ন কণ্ঠস্বর।

'শরাব নিয়ে পড়েছিলে তো? এ দিকের খবর জানো?'

'জানি। শরাব আমি খাইনি লুৎফা।'

আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। শরাব খায়নি অথচ এমন ভাঙা ভাঙা গলা কেন সিরাজের? তবে কি শোকে এমন হয়েছে? এত বড় ভুল হলো আমার? তার মুখের দিকে ভালোভাবে চেয়ে দেখি। সে মুখে দুঃখ শোক আর বিষাদের ছায়া। নিজের টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে হলো। এ আমি কি করলাম? একবার ভালোভাবে চেয়ে দেখলাম না পর্যন্ত।

সিরাজের কোলের মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি।

'কেঁদো না লুৎফা।' সে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

'আমাকে শাস্তি দাও।'

'তুমি তো কোনো অন্যায় করোনি লুৎফা। যে যেরকম, তাকে সেরকম ভাবাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু আমার এত বড় ভুল কেন হবে? তোমাকে চিনতেও আমার ভুল হবে?'

'ক্ষতি কি? আমাকে তুমি ভালোবাসো বলেই ভুল হয়েছে। অন্য বেগমদের ভুল হবার বালাই নেই। কিন্তু এখন কি করি লুৎফা? আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না।'

'ছিঃ নবাবজাদা, ভেঙে পড়ছো কেন? যে-আঘাত তুমি পেলে, নবাবরাই সে আঘাত পায়। তুমি

তো সাধারণ মানুষ নও। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখও সাধারণ। তোমার সুখ যেমন অসাধারণ, দুঃখও তেমনি অসাধারণই তো হবে। তোমার বুক যেমন বিরাট, মন যেমন বিরাট, সহ্য শক্তিও তেমনি বিরাট হওয়া চাই। নইলে তুমি সিরাজদ্দৌলা কিসে?'

সিরাজের কোল থেকে মুখ তুলে দেখি, সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। তার চোখে জল টলমল করছে।

'লুৎফা!' তার বলার হয়তো অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু আমার নামটুকু ছাড়া আর কিছুই সে উচ্চারণ করতে পারল না। বুঝলাম, পৃথিবীতে আমার সব চাইতে প্রিয়জনকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পেরেছি।

'এ দু'দিন কোথায় ছিলে নবাবজাদা? তোমাকে আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।

'রোশনীবাগে।'

'একা ছিলে সেখানে?'

'হ্যাঁ'।

'রোশনীবাগে কি কোনো ঘর রয়েছে নবাবজাদা?'

'একটা ছোটমতো আছে। কিন্তু আমি তো সেখানে ছিলাম না।'

'তবে কোথায় ছিলে?'

'একটা আমগাছের গোড়ায়।'

'দু'দিন আমগাছের গোড়ায় বসেছিলে?'

'হ্যাঁ লুৎফা।'

'তুমি কি আমাকে পাগল করবে?'

'ওতে আমাদের কষ্ট হয় না, লুৎফা। আমরা যে যুদ্ধ করি। বরং ভালোই হয়েছে ওতে। শরীরের কষ্ট যতটা হয়েছে, তাতে মনের কষ্ট কিছুটা কমেছে।'

'কিছু খাওনি তো দু'দিন?'

'পাবো কোথায়?'

'তুমি শুয়ে থাকো, আমি এখন আসছি।'

কিমা-সুর্‌রা সিরাজের প্রিয় খাদ্য। নিজের হাতে নিয়ে এলাম। এসে দেখি, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা! দু'দিন ঘুমোয়নি, ঘুমোক একটু।

কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ সে জেগে উঠল। পেটে খিদে থাকলে ঘুমও হয় না।

'খানা এনেছো?'

'এনেছি।'

'দাও।' সে সাগ্রহে খেতে শুরু করে।

'একটা কথা বলবো নবাবজাদা?' খাওয়া শেষ হয়ে আসার সময় প্রশ্ন করি।

'বলো।'

'একটা প্রার্থনা আছে।'

'কি প্রার্থনা?'

'পূর্ণ হবে তো?'

'শুনিই না।'

'এবার থেকে দু'বেলা আমার কাছেই খাবে, কেমন?'

সিরাজ খাওয়া থামিয়ে কি যেন ভাবে। তার মুখে মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে যায়। বলে, 'আমাকে বন্দী করতে চাও লুৎফাউন্নেসা।'

'যদি বলি তাই, ক্ষতি আছে?'

'না, লুৎফাউন্নেসা সাধারণ বেগম নয়। সে আমার প্রাণের আধখানা। তার হাতে বন্দী হবো এতে ক্ষতি কি, বরং লাভ।'

'প্রার্থনা মঞ্জুর হলো তো?' আমার চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

'হুঁ। কিন্তু একেবারে রাশ টেনে ধরো না বেগমসায়েবা, ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা।'

'আমি জানি নবাবজাদা। একেবারে রাশ টেনে ধরার মতো মূর্খ আমি নই। তাহলে এখুনি মেহেদি নেশার খাঁয়ের সঙ্গে মিশতে মানা করে দিতাম।'

সে চমকে আমার দিকে দৃষ্টি ফেলে। তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে, 'তুমি বুদ্ধিমতী লুৎফা।'

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে শুধু হাসি।

সিরাজের মা আমিনা বেগম মুর্শিদাবাদে চলে এলেন। সিরাজের ভাই এক্রামউদ্দৌলাকে নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। নিঃসন্তান নওয়াজিসের বুভুক্ষু-প্রাণ শীতল হলো এতদিনে। জীবনে এই প্রথম তিনি ঘসেটি বেগমের মতের বিরুদ্ধে গেলেন। এক্রামকে পুত্র হিসাবে নেবার ইচ্ছা ঘসেটির আদৌ ছিল না। সে নারী, কিন্তু নারীর সব কয়টি গুণ তার মধ্যে স্ফুটিত হয়নি। তার নারীত্বে মাতৃত্বের স্থান নেই, বধূত্বের স্থান নেই, সে শুধু প্রিয়া হতে চায়।

প্রথমে সে নওয়াজিস খাঁর প্রিয়া ছিল। এখন নওয়াজিস পুরোনো হয়ে গিয়েছে। অতি পরিচিত পুরুষের কাছে প্রিয়া হবার রোমাঞ্চ থাকে না। তাই বেগম হয়েও সে খাঁ সাহেবকে এড়িয়ে চলে।

এখন সে হোসেন কুলিখাঁর প্রিয়া। সম্ভবত হোসেন কুলিখাঁও পুরোনোর দলে যেতে বসেছে। হাবভাব দেখে তাই-ই মনে হয়। সেদিন আর একজনকে দেখলাম। মীর নজরালি তার নাম। সঠিক না জেনে বলতে ভরসা হয় না, তবু মনে হয়, ঘসেটি নতুন টোপ ফেলেছে। মীর নজরালি ঘসেটির চারের নতুন মাছ। দেখতে হবে কতদূর গড়ায়।

কিন্তু তার আগে একটা ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। কি করবো ভেবে পেলাম না। অথচ আমি আর জারিয়া নই, আমি বেগম। নবাব বংশের মঙ্গল, নবাব মহলের পবিত্রতা রক্ষার এক বিরাট দায়িত্ব আমার রয়েছে। ঘসেটি বেগম হলেও না হয় এড়িয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ও যে ঘসেটি নয়। এ এমন একজন, যার কথা বলতে লজ্জায় আমার মুখ বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু কি করবো? কর্তব্য বড় কঠিন জিনিস।

মাঝে মাঝে এখনো গিয়ে দাঁড়াই সেই গবাক্ষের সামনে। কাটরার আজানধ্বনি শুনি। বেশ লাগে। সেদিনও দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাইরে থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। একটু অন্যমনস্কই ছিলাম। হঠাৎ পদশব্দ কানে এলো। কে যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। জারিয়া-সুলভ ভীতি আমার আর নেই। তাই নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম।

হোসেন কুলিখাঁ! হ্যাঁ, তিনিই আসছেন। সরে যেতে হলো। আমি বেগম, পর্দানশীন। পরপুরুষের সামনে মুখ দেখানো বাধা। বেগম মহলে সঙ্গে বোরখা থাকে না, এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাই আড়ালে গেলাম। হোসেন কুলিখাঁর ওপর মনে মনে ভীষণ রাগ হলো। তাঁর এই চৌর্যবৃত্তিই বোধহয় তাঁর চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা।

কিন্তু তিনি আবার এখানে কেন? তিনি না জানলেও ঘসেটি বেগম তো জানে, তাদের নোংরামি আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। ঘসেটি আর যাই হোক, মূর্খ নয়। বরং সে ভীষণ চতুর। সে কখনো আর এদিকে আসবে না। কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে সেই অন্ধকার গোপন জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি।

হোসেন খুলিখাঁ গবাক্ষের সামনে এসে থেমে গেলেন। চোরের মতো এদিকে ওদিনকে তাকান। তাঁর মতো পুরুষের এই রকম চাহনি দেখে আমার কষ্ট হয়। একটু কৌতূহলও যে অনুভব না করি তা নয়।

মনে মনে প্রস্তুত হই। ঘসেটি আসার আগেই সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার পশুত্ব বোধহয় চতুরতাকে জয় করেছে। তাই একই জিনিস আবার ঘটতে চলেছে।

লঘু পদশব্দ ভেসে আসে। আসুক, একেবারে কাছে আসুক। হোসেন কুলিখাঁর সামনে দাঁড়াক, তারপরে আত্মপ্রকাশ করবো। ভেবেছে বেগম হয়ে আমি বুঝি ঘর ছাড়ি না। কিন্তু আমি শুধু বেগম নই, আমি লুৎফা। আজ একটা চূড়ান্ত পরিণতি দেখে আমি নিশ্চিন্ত হবো। ঘসেটি মুক্তার মালা দিয়ে আমার ভেতরের মানুষটাকে কিনতে পারবে না। ওর কাছে আমার দেওয়া কথারও কোনো দাম নেই। কিন্তু একি! ঘসেটি তো নয়। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? চোখের ভুল নয় তো? বার বার চোখ রগড়াই। না, ভুল নয়। সিরাজ জননী আমিনা বেগম এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে হোসেন কুলিখাঁর মুখে হাসি ফোটে। আমিনা বিবির মুখেও হাসি। ছি-ছি, তাঁর এই জঘন্য মনোবৃত্তি! আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হলো—চোখ বন্ধ করি। না-না, কিছুতেই দেখতে পারবো না। মরে গেলেও নয়।

'এই মুহূর্তটুকুর জন্যেই বোধহয় এতদিন বেঁচেছিলাম আমিনা।' পুরুষের গম্ভীর স্বর।

'ঘসেটিকেও এই কথা বলতে নিশ্চয়?'

'ছি-ছি, কি যে বলো তুমি!'

'ঠিকই বলছি। পুরুষদের আমি চিনি।'

'আমাকে তুমি চেনোনি এখনো। ঘসেটি বেগম আমার প্রভুপত্নী। তাঁর সঙ্গে এ সম্পর্ক হবে কেন?'

'আমার সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক সমানে সমানে নয় হোসেন কুলিখাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হোসেন কুলিখাঁ নিশ্চয় আহত হয়েছে আমিনা বিবির কথায়।

'দিলটাই আদত জিনিস আমিনা। ভালোবাসা কখনো সম্পর্ক বাছে না।'

'শুধু ঘসেটি বেগম ছাড়া, তাই না?' তিন সন্তানের জননী আমিনা বেগমের গলায় কিশোরীর খিলখিল হাসি। শুনে আমার গায়ে জ্বালা ধবে। আর শুনতে ইচ্ছে হয় না। এরপর যে কোনো শব্দ কানে এলে আমি মূর্চ্ছা যাবো·–আমি ধরা পড়ে যাবো। দু'হাত দিয়ে দু'কান চেপে ধরে বসে পড়ি। চোখ বন্ধ করি।

বহুক্ষণ কেটে যায়। ধীরে ধীরে চোখ মেলি। কেউ নেই, দু'জনে চলেই গিয়েছে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বেগমসায়েবাকে আজই সব বলতে হবে। এরপরেও মুখ বুজে বসে থাকার অর্থ সর্বনাশ ডেকে আনা এবং এই সর্বনাশের জন্যে মূলত আমিই দায়ী হবো।

বেগমসায়েবার ঘরে প্রবেশের আগে একবার আমিনা বিবির ঘরে যেতে ইচ্ছে হলো। সিরাজ-জননীর কাছে আমি প্রায়ই যাই। তিনি আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। এ সময় তাঁর কাছে গেলেও কোনো সন্দেহের ছায়াপাত হবে না তাঁর মনে।

কিন্তু ঘরের সামনে গিয়ে থেমে যেতে হলো। ভেতরে তিনি একা নেই। ঘসেটি বেগমের গলা ভেসে আসছে। মনে হলো, চড়া গলায় ঘসেটি কি যেন বলছে আমিনা বিবিকে। বেগম হয়েও লুকিয়ে শোনার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

'এসেই খেলা শুরু করেছিস্ আমিনা। ছেলেবেলার অভ্যাস এখনো যায়নি দেখছি।'

'কি করে যাবে, তোর কাছেই যে হাতেখড়ি।'

'মুখ সামলে কথা বল্। তোর মতো বংশের মুখে চুনকালি দিইনি কোনোদিন।'

'কানে তো অনেক কিছুই ভেসে যেতো। মুর্শিদাবাদ থেকে পাটনা বড় কম দূর নয়। অত দূরে

ভাসতে ভাসতে গিয়ে খাঁটি সংবাদই পৌঁছতো। মিথ্যেটুকু হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো।'

'চুপ কর্।' ঘসেটি চেঁচিয়ে ওঠে।

'ভয় দেখাচ্ছিস্ কাকে? নবাব আলিবর্দির মেয়েকে? বাংলার ভবিষ্যৎ নবাবের মাকে?' আমিনা বিবি হি-হি করে হাসেন।

'পরবর্তী নবাব সিরাজ নয়, নওয়াজিস।'

'ও, তাই নাকি? তবু তো নওয়াজিস মরলে এক্রাম নবাব হবে। এক্রাম তোর ছেলে নয়, আমার!'

'ঘসেটিকে তুই চিনিস্ না আমিনা। কি রকম ভয়ঙ্কর হতে পারি, সে ধারণা তোর নেই।'

'হাজার ভয়ঙ্কর হলেও আমার পা অবধি পৌঁছতে পারবি না ঘসেটি।'

'বেশ, দেখা যাবে। আজই নবাবকে বলবো তোর সঙ্গে হোসেন কুলিখাঁর সম্বন্ধ।'

'আমিও বলবো যে, এতদিন সে আমার টানে বেগম মহলে ঘোরাফেরা করতো না।'

'নবাব সে-কথা বিশ্বাস করবেন না।'

এবার আমি ভেতের ঢুকি। দু'জনাই অপ্রস্তুত হয় আমার আকস্মিক প্রবেশে।

আমিনা বিবি স্বাভাবিক গলায় বলেন, 'কি খবর লুৎফা, হঠাৎ এ সময় যে?'

'বাইরে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনাদের ঝগড়া শুনে চলে এলাম।'

'ঝগড়া শুনতে পেয়েছো?' ঘসেটি বেগম উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে।

'সামান্য শুনেছি।'

'কি শুনেছো?' আমিনা বেগম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ান।

'আপনার শেষ কথাটুকু শুনেছি—'হোসেন কুলিখাঁ এতদিন আমার টানে বেগম মহলে ঘোরাঘুরি করতো না।'

আমিনা বেগমের মুখ মৃতের মতো রক্তশূন্য হয়ে যায়। তিনি মাটিতে বসে পড়েন। ঘসেটির চোখে নিদারুণ আতঙ্ক। ঘরে বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। জাদুবিদ্যায় সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে যেন—হৃদ্‌কম্পন পর্যন্ত। শুধু বাতিগুলো নিঃশব্দে পুড়ে চলেছে। বাতির ওপর পতঙ্গ উড়ে এসে পড়ছে। তারা মৃত অবস্থায় নীচে গালিচার ওপর ঝরে পড়ে। দু' চারটে আমিনা বিবির কোলের ওপর গিয়ে পড়ছে।

আমি স্তব্ধতা ভঙ্গ করি। সোজা ঘসেটি বেগমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কণ্ঠস্বরে বজ্রকঠিন দৃঢ়তা এনে বলি, 'হোসেন কুলিখাঁ যে চোরের মতো বেগম মহলে বহুদিন থেকে ঘোরাফেরা করেন তার প্রধান সাক্ষী আমি। একথা আপনি জানেন ঘসেটি বেগম। শুধু ঘোরাফেরা নয়, আরও অনেক কিছু তিনি করেন, যার একটা কথা নবাবের কানে গেলে হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। কিন্তু আজ যা নিয়ে আপনাদের ঝগড়া আর মন কষাকষি, তারও প্রধান সাক্ষী আমিই আবার হলাম, এ আমার দুর্ভাগ্য। ঘসেটি বেগম, সেদিন আপনাকে যেখানে ছিন্নভিন্ন পোশাকে পড়ে থাকতে দেখে আমি তুলতে গিয়েছিলাম, ঠিক সেইখানেই আর এক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল কিছুক্ষণ আগে। এর গোড়াপত্তন হয়তো কিছুদিন আগে থেকেই হয়েছে, যার জন্যে আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আজ ঠিক কি ঘটেছে, তা আপনি জানেন না। আজ খাঁ সাহেবকে আবার সেখানে দেখে প্রথমে আমি অবাক হয়েছিলাম। আপনার চতুরতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু সংশয় দূর হলো আমিনা বিবিকে দেখে। আমিনা বিবি বহুদিন এখানে ছিলেন না, তাই ওই নির্জন স্থানে যে আমার রীতিমতো যাতায়াত আছে একথা তিনি জানতেন না। কিন্তু হোসেন কুলিখাঁকে অন্তত আপনার বলে দেওয়া উচিত ছিল।'

কথা শেষ হতে দেখি, ঘসেটি বেগম হিংস্র দৃষ্টিতে আমিনা বিবির দিকে চেয়ে রয়েছে। আর আমিনা বিবি ধীরে ধীরে গালিচার ওপর গড়িয়ে পড়েন। অপরিসীম লজ্জা আর আঘাতে তিনি মূর্চ্ছা গিয়েছেন।

সব কথা না বলে আমার উপায় ছিল না। শুধু এখানেই নয়, বেগমসায়েবাকেও বলতে হবে। প্রতিকার চাই। দুই বোনই মরিয়া। ছেলেবেলা থেকে পাকানো অভ্যাস আবার পথ খুঁজে পেয়েছে।

'আমিনা বিবিকে ধরে তুলুন ঘসেটি বেগম।' আমি বলি।

'আমি পারবো না।' সে রাগে ফুলতে থাকে।

'আপনিই আমিনা বিবিকে সুযোগ দিয়েছেন। হোসেন কুলিখাঁ এখানে এমনিতে আসতেন না কখনো।'

'বেশ, বেশ।'

'আমি বেগমসায়েবার ঘরে যাচ্ছি।'

'মাকে এসব কথা বলবে?'

'নিশ্চয়ই বলবো।'

'প্রতিজ্ঞার কথা তোমার মনে নেই?'

'সে প্রতিজ্ঞা এখানে খাটে না। তাছাড়া আমিনা বিবি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাননি।'

'কিন্তু আমিনার কথা উঠলে আমার কথাও কি উঠবে না?'

'তা উঠবে বৈকি!'

'লুৎফা, তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো।'

'না, আপনাদের স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়েছে। সেটা বন্ধ করতে আমি বদ্ধ পরিকর।'

আমিনা বিবি ধীরে ধীরে উঠে বসেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন, 'তুমি এসব কি বলছো লুৎফা!'

'আমি বেগমসায়েবার কাছে যাচ্ছি, হোসেন কুলিখাঁ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন তিনি। ঘসেটির মতো দৃঢ়তা তাঁর নেই। উঠে এসে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলেন, 'আমার ছেলের বেগম তুমি। তবু তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। মাকে এসব কথা বলো না। একে তো লজ্জায় তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছি না, এরপর মায়ের কানে গেলে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।'

তাঁর কথায় আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। মুহূর্তে আমার সমস্ত দৃঢ়তা কোথায় ভেসে যায়। তিনি যে সিরাজের মা।

'বলো লুৎফা, বলবে না মাকে? বলো, কথা দাও।'

'বেশ, কথা দিলাম।' আমি ছুটে বার হয়ে যাই। পেছনে চাইতে পারি না। জানি, তাহলে ঘসেটির বিদ্রূপের হাসি আমার চোখে পড়বে।

তবু বেগমসায়েবার ঘরের দিকে যাই। মনে মনে ভাবি, আমার প্রিয় অতি পরিচিত জায়গাটিতে আর কখনো দাঁড়াবো না। একসময় যা আমার একমাত্র আশ্রয় আর সান্ত্বনার স্থল ছিল, আজ তা আমার মন আর জীবনকে এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।

বেগমসায়েবা তেমনি বসে রয়েছেন। তাকিয়ায় ভর দেওয়া বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর রাখা সমস্ত শরীরের ভার। কপালে সেই চিরপরিচিত চিন্তার রেখা। বয়সের জন্যে সে রেখা আরও গভীর, আরও প্রকট।

আমাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'এত তাড়াতাড়ি তুমি কি করে এলে লুৎফা?'

'কেন বেগমসায়েবা!' তাঁর কথায় অবাক হই।

'হামিদাকে তো এখুনি পাঠালাম।'

'সে আমার কাছে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়নি?'

'আমি ঘরে ছিলাম না।'

'ঘসেটির ঘরে ছিলে বুঝি?'

'না, আমিনা বেগমের ঘরে।'

'আমিনার ঘরে! কখন গিয়েছিলে?'

'কিছুক্ষণ আগে। ঘসেটি বেগমও সেই ঘরে আছেন।'

'তা কি করে হবে! তার তো সেখানে থাকার কথা নয়।' বেগমসায়েবার উক্তিতে শ্লেষ। এভাবে এই প্রথম তাঁকে কথা বলতে শুনলাম।

আমি চুপ করে থাকি। এমন কিছু ঘটেছে, যা তাঁর মতো স্থির বুদ্ধিসম্পন্না নারীকেও বিচলিত করে তুলেছে। কি বলবো ভেবে পাই না।

'লুৎফা, একদিন যে পুরুষটির কথা তুমি আমাকে বলেছিলে, এতদিনে তার পরিচয় পেলাম। যদিও আগে আন্দাজ করেছিলাম, আজ নিঃসংশয় হলাম।'

আমি কেঁপে উঠি। নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত করে বলি, 'কোন্ পুরুষ বেগমসায়েবা?'

'যাকে হারেমে ঘোরাফেরা করতে দেখে আমার কাছে ছুটতে ছুটতে এসে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারোনি একদিন।'

'কে সে?'

'হোসেন কুলিখাঁ। কার লোভে আসে জানো? দাসী-বাঁদীদের লোভে নয়, অন্য কোনো বেগমের লোভেও নয়। আসে আমারই গর্ভের এক কলঙ্কিনীর আদেশে তার মনোরঞ্জন করতে। ঘসেটি এখন আমিনার ঘরে? তা তো হতে পারে না। আমার হিসেবে কি তবে ভুল হলো?'

হিসেবে তাঁর মস্ত ভুল হয়েছে, কিন্তু সে-কথা বলি কি করে? এই মুহূর্তে যে কথা দিয়ে এলাম আমিনা বেগমকে। বেগমসায়েবা আর কতটুকুই বা জানেন। আসল ঘটনা শুনলে তিনি কি করবেন ভাবতেও ভয় করে।

'আপনি কি করে জানলেন বেগমসায়েবা?'

'তুমি কি ভেবেছো তুমি না বললে আমি জানতে পারবো না?' আমাকে যেন ধমক দেন তিনি।

'আমি তো জানতে পারিনি।'

'মিথ্যে কথা। অনেক আগেই তুমি জানতে পেরেছিলে। সঙ্কোচে বলতে পারোনি। এই সর্বনাশা সঙ্কোচ ভালো নয় লুৎফা। বেগমদের কাছে সঙ্কোচের স্থান নেই।'

বেগমসায়েবার দুই হাঁটু ধরে আমি কেঁদে ফেলি।

'কেঁদো না। তোমার অসুবিধে আমি জানি। কিন্তু যারা খারাপ, তারা খারাপই। তাদের জন্যে কোনো দ্বিধা মনে স্থান দেওয়া অন্তত সিরাজের বেগমের শোভা পায় না, যে সিরাজ একদিন মসনদে বসবে।'

'বেগমসায়েবা।' মুখ তুলে বলি।

'হ্যাঁ, বলো। আরও অনেক কিছু জানো তো?'

'জানি। কিন্তু আমার একটা প্রার্থনা আছে।'

'বলো।'

'যাঁর সম্বন্ধে আজকে আপনাকে বলবো, তিনি যেন কোনোদিন টের না পান যে তাঁর কথা আপনি জানেন।'

'বেশ, তাই হবে।'

আমিনা বেগমকে কথা দিলেও সে কথার মূল্য রাখতে পারলাম না। আমি যে সিরাজের বেগম।

মহলের মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গল, সবার মঙ্গল দেখাই যে আমার কর্তব্য। যা-যা দেখেছি একে-একে সব বলে গেলাম। আজকের আমিনা বেগমের ঘটনাও বাদ দিলাম না।

আমার কথা শুনে বেগমসায়েবা অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করলেন। মাঝে মাঝে দুই হাত মুঠো করে শূন্যে তুলে আস্ফালন করেন, আবার কখনো আপন মনেই চেঁচিয়ে ওঠেন। স্তব্ধ আতঙ্কে আমি ঘরের এককোণে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি।

'তুমি আমাকে দিয়ে বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছো লুৎফা। এ তোমার উচিত হয়নি।' তিনি দাঁতে দাঁত ঘসে বলেন, যেন তাঁর সমস্ত আক্রোশ আমার ওপর।'

'কি করবো, উনি যে নবাবজাদার মা।'

চিৎকার করে ওঠেন তিনি, 'মা, মা, মা। কে মা? কার মা? এককালে গর্ভে ধরেছিল বলেই মা! খাসা।' অতিমাত্রায় উত্তেজিত হবার পর বেগমসায়েবা কেমন ঝিমিয়ে পড়েন। ধপাস্ করে পালঙ্কের ওপর বসে পড়েন।

আমি ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে আসি। সবার অজ্ঞাতে বারুদের স্তূপে আগুন দিয়ে এলাম।

কয়দিন ধরে সিরাজ বড্ড বেশি শরাব খাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, নবাব আলিবর্দি তাকে পাটনার শাসনভার দিয়েছেন বলে সে আনন্দ করছে। এই বয়সে এত বড় মর্যাদা তো যার-তার ভাগ্যে হয় না। তার ওপর সহকারী হিসাবে সে পেয়েছে রাজা জানকীরামের মতো লোককে। জানকীরাম ইতিমধ্যেই পাটনা রওনা হয়ে গিয়েছেন। সিরাজকে নবাব ছাড়েননি। কবে ছাড়বেন জানি না!

আজও মাতালের মতো টলতে টলতে সে আমার ঘরে এলো। তবু যা হোক সে তার কথা রাখছে। দু'বেলা আমার কাছে এসে খানা খেয়ে যাচ্ছে। তবু যেভাবে শরাবের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, তাতে কতদিন সে তার কথা রাখতে পারবে জানি না। সে যতক্ষণ আমার কাছে থাকে, মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে সব কিছু করে যাই। কিন্তু সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর থাকতে পারি না, কান্নায় ভেঙে পড়ি। নবাবের বেগমদের ভাগ্য কি একরকম হতেই হবে? আলিবর্দির বেগম কি তাহলে সৃষ্টিছাড়া?

সিরাজ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। তার দুটো চোখ সব সময় কিসের চিন্তায় যেন মশগুল। শরাবের শক্তি তার চিন্তাকে এতটুকু বিভ্রান্ত করতে পারছে বলে বোধ হলো না। এ কয়দিনে সে ভীষণ শুকিয়ে উঠেছে।

তার সামনে খাবার রাখতে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি এনেছো?'

'দমপোক্ত।'

'খাবো না।'

'তুমি তো ভালোবাসো।'

'আঃ, বাজে কথা বলো না! খাবো না, ব্যস্!'

'কি খাবে বলো, আমি এনে দিচ্ছি?'

'কিস্‌সু খাবো না। কিস্‌সু ভালো লাগে না।'

'তাহলে যে শরীর টিকবে না, নবাবজাদা।'

'কি লাভ বেঁচে থেকে?'

ভাবলাম, শরাবের নেশায় আবোল-তাবোল বকছে নিশ্চয়। চুপ করে বসে থাকি। আগে নেশা কাটুক, তারপর কথা বলা যাবে।

কিন্তু কোনো লাভ হলো না। সিরাজের চিন্তার যেন আদিঅন্ত নেই। ভেবেই চলেছে সে। দেওয়ালের দিকে তার দৃষ্টি স্থির, নিবদ্ধ। শেষে কি পাগল হয়ে যাবে? কেউ কিছু খাইয়ে দেয়নি তো?

শরাবের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দেওয়া বিচিত্র নয়। শত্রুর অভাব নেই ভবিষ্যৎ নবাবের—ঘরে-বাইরে শত্রু!

'তোমার কি হয়েছে, নবাবজাদা?'

'কিস্‌সু হয়নি।'

'না, বলতেই হবে তোমাকে। দিনের পর দিন মুখ শুকনো করে থাকবে তা হবে না।' সিরাজের হাত চেপে ধরি।

'আমি উঠে যাচ্ছি।' সে সত্যিই উঠে দাঁড়ায়।

এবার তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ি। সে পা দিয়ে আমাকে ঠেলে দেয়। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে নিজেই আমার গায়ের ওপর এসে পড়ে।

'ফেলে দিলে, লুৎফা?'

'আমি ফেলিনি, নবাবজাদা। তোমার শরীর দুর্বল, তাই আমাকে লাথি দিয়ে সামলাতে পারোনি নিজেকে।'

'ও, তাই হবে।' সে এমনিভাবেই আমার গায়ের ওপর পড়ে থাকে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাও করে না। তার সমস্ত শরীরের ভার আমার ওপর। তাই নিজেও উঠতে পারি না। মনে হলো, সিরাজ শুয়ে পড়েও ভাবছে। তার চিন্তাসূত্র এতটুকু বিচ্ছিন্ন হয়নি। বাইরের ঘটনাগুলো তার মনে এতটুকু রেখাপাত করেনি।

'উঠবে না?'

'ও হ্যাঁ, উঠতে হবে। তোমার কষ্ট হচ্ছে, লুৎফা?'

'না।'

'তাহলে একটু শুয়ে থাকি।'

'এভাবে শুয়ে থাকবে কেন? ওঠো ভালোভাবে শোও।'

'না, এই বেশ।'

'কেউ এলে দেখে ফেলবে যে।'

'ও, দেখে ফেলবে? তাহলে তো উঠতে হয়, তাই না লুৎফা?'

'তোমার কি হয়েছে? এভাবে কথা বলছো কেন? ভয় হয় আমার।'

'কিভাবে বলছি? ঠিক বলছি না?'

'না, মোটেই না।'

সিরাজ চুপ করে থাকে। সে তখনও ভেবে চলে।

'চলো খাবে।'

'তোমার রাগ হয়নি, লুৎফা?'

'কেন?'

'তোমাকে লাথি মেরেছি বলে।'

'সেজন্যে তোমার অনুতাপ হয়েছে?'

'হুঁ।'

'তাহলে আর রাগ নেই।'

'অন্য বেগম হলে কিন্তু আমার সঙ্গে কথাই বলতো না।'

'তারা যে বেগম।'

'আর তুমি?'

'আমি? আমি তোমার প্রাণের আধখানা। তুমিই তো বলেছিলে।'

সিরাজ আমাকে জড়িয়ে ধরে।

'তুমি কি পাটনায় যেতে চাও, নবাবজাদা?'

'কেন?' সে অবাক হয় আমার কথায়।

'নবাব যেতে দিচ্ছেন না বলে তোমার দুঃখ হয়েছে?'

'তা একটু হয়েছে বৈকি।'

বুঝলাম, ঠিক ধরতে পারিনি। সিরাজের আসল কষ্ট পাটনার জন্যে নয়। সহসা একটা কথা ভেবে চমকে উঠি। তবে কি সে হোসেন কুলিখাঁর কথা শুনেছে? বেগমসায়েবা কি তাকে সব খুলে বলেছেন?

'তুমি বেগমসায়েবার কাছে গিয়েছিলে, নবাবজাদা?'

'ও কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'এমনি।'

'আজ যাইনি।'

'কবে গিয়েছিলে?'

'পাঁচদিন আগে।'

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক পাঁচদিন আগে, যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বেগমসায়েবাকে সব খুলে বলি।

'সেদিন কখন গিয়েছিলে তাঁর কাছে?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি।

'রাত্রে।'

আর ভুল নেই। বেগমসায়েবা তাঁর কথা রাখতে পারেননি। সিরাজকে তার মায়ের কেলেঙ্কারির কথা বলে দিয়েছেন। সমালোচনা করা আমার শোভা পায় না। তবু বলবো তিনি অন্যায় করেছেন। সিরাজকে না জানিয়ে তিনি অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারতেন। তার মনকে ওভাবে ভেঙে দেবার প্রয়োজন ছিল না তাঁর।

সিরাজ ধীরে ধীরে উঠে বসে। সে আমার হাত ধরে তুলে বলে, 'চুপ করে আছো কেন, লুৎফা?'

'বেগমসায়েবার কাছে কিছু শুনেই কি তোমার মন খারাপ?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?' সে শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরে।

'অনুমান।'

'কখনো নয়। তুমি সব জানো। বলো, সত্যি কিনা? বলো....'

'সত্যি।' মিথ্যে বলার শক্তি ছিল না।

সে স্থির হয়ে বসে থাকে, যেন মাটির পুতুল—জীবনের কোনো স্পন্দন নেই। আমিও দাঁড়িয়ে থাকি, বলার কিছু নেই। এখন সান্ত্বনার বাক্য বিদ্রূপের মতো শোনাবে।

বহুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে, 'ভালোই হলো লুৎফা, তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। মনের মধ্যে চেপে রেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি পাগল হবো। কিন্তু কই, তুমি তো আমাকে বলোনি? তুমি বলতে পারতে।'

'ক্ষমা করো আমাকে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।'

'স্বাভাবিক। যাক্, ভালোই হলো।'

'বেগমসায়েবা কি তোমাকে আর কিছু বলেছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু যা বলেছেন, আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়। দাদি আরও কয়েকবার আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন, আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'কি বলেছেন তিনি?'

'হোসেন কুলিখাঁকে হত্যা করতে, কিন্তু একি সম্ভব? তুমিই বলো লুৎফা, এমন একজন লোককে হত্যা করা যায়? সে কৌশলী, কর্মঠ আর রাজকার্যে বিশ্বস্ত। দোষ তার যতই থাকুক, তার চেয়েও সহস্রগুণ দোষ এ পক্ষের। হোসেন কুলিখাঁ কখনো প্রথমে এগিয়ে আসেনি, আসতে পারে না। তাই বলছি, ব্যবস্থা যদি কিছু করতে হয়, তাহলে মাতৃহন্তা হতে হয়।'

'না-না।' আমার মুখ দিয়ে আর্তনাদ বার হয়ে আসে। সিরাজের চোখের দিকে তাকাতে পারি না।

'ভয় নেই লুৎফা, মাতৃহন্তা হবো না, কিন্তু হোসেন কুলিখাঁকে মারতেও পারবো না। সে এমন একজন লোক, যাকে হত্যা করলে দাদুর নবাবীও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। শত্রুরা এ হত্যার পুরোপুরি সুযোগ নেবে।'

'তবে তাঁকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দাও। রাজা জানকীরামকে পাটনা থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকেই সেখানে পাঠাও।'

'ঠিক। একথা আমার আগে মনে হয়নি। কালই নবাবকে বলবো।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আমি।

চারদিন পর।

সিরাজের জন্যে বসে রয়েছি। আসতে বড় দেরি হচ্ছে তার। দুপুর গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হলো, তবু দেখা নেই। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

সোফিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। তার উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একটা ঘোর অমঙ্গলের বার্তা লেখা রয়েছে সে-মুখে। সিরাজের কি তবে কিছু হলো?

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? বলো কি হয়েছে?' চীৎকার করে উঠি।

'আপনি শোনেননি এখনো?'

'না, বলো।' চোখে জল এসে যায় আমার।

'আপনি কাঁদছেন কেন?'

'না শুনে কি কাঁদা যায় না? মন বলে কি কোনো জিনিস নেই?'

'কিন্তু এতে আপনার কাঁদার তো কথা নয়। আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় শুনেছেন সব। তাই বলতে এসেছিলাম যে কাজটা খুব ভালো হলো না।'

'কোন্ কাজ? বলেই ফ্যাল্ না শয়তানী।' ছুটে গিয়ে সোফিয়ার চুল চেপে ধরি।

'ছাড়ুন বেগমসায়েবা, বলছি।'

চুল ছেড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকাই।

সে ঢোক গিলে বলে, 'বলছিলাম, হোসেন কুলিখাঁকে এভাবে মেরে ফেলা উচিত হয়নি।'

'কি বললে? হোসেন কুলিখাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে? কে মারলে?'

'নবাবজাদা সিরাজদ্দৌলা।'

'মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না।'

'মিথ্যে নয়। বাজারের মধ্যে নবাবজাদার সামনে হোসেন কুলিখাঁর মাথা কাটা হয়েছে। সেখানে তাঁর দেহ এখনো ঝুলছে একটা বাঁশের মাথায়।'

'না-না, এ কখনো হতে পারে না। তুমি ভুল শুনেছো সোফিয়া।'

'মহম্মদ সেখানে ছিল।'

'মহম্মদ সত্যবাদী নয়।'

'তবে যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করুন, সত্য জানতে পারবেন।' সোফিয়া রাগ করে চলে যায়। তার সামনে মহম্মদ সম্বন্ধে আজই প্রথম বিরূপ মন্তব্য করলাম।

পাথরের মতো বসে থাকি। বেগম, বেগম, বেগম। বেগম হওয়ার সুখ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। হতে চাই না বেগম। সিরাজকে নিয়ে যদি কোথাও পালাতে পারতাম কোনো নির্জন গাঁয়ের কোলে, তাহলে বেঁচে যেতাম। কি হবে ঐশ্বর্যে, কি হবে নবাবীতে? সাধারণ মানুষের সুখদুঃখই ভালো। তাতে এত খুনোখুনির ব্যাপার নেই, এত ব্যাভিচারও নেই।

কিন্তু সিরাজ তো যাবে না। নবাবীর রক্ত যে তার শরীরের প্রতিটি ধমনীতে ছোটাছুটি করছে। সে চায় উত্তেজনা, উন্মাদনা, আর উচ্ছৃঙ্খলতা। সে চায় যুদ্ধ আর মৃত্যু।

সোফিয়ার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। মহম্মদ বোধহয় তার মুখোশ খুলতে শুরু করেছে। যেমন মহম্মদ, তেমনি মেহেদি নেশারখাঁ—দু'জনেই সমান। দু'জনের আওতা থেকে সিরাজকে মুক্ত করতে হবে।

হোসেন কুলিখাঁকে যে হত্যা করা হয়েছে একথা মিথ্যে হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সিরাজের আদেশে তিনি হত হতে পারেন না। যে সিরাজ তাঁর পক্ষ নিয়ে সেদিন অত কথা বললো, এরই মধ্যে তার মনোভাবের এমন আকস্মিক পরিবর্তন অসম্ভব। তবু মনটা চঞ্চল হলো। সিরাজ না এলে কিছুই বুঝে ওঠা যাবে না।

অবশেষে সিরাজ এলো। রক্তরাঙা চোখ নিয়ে ঢুলতে ঢুলতে এলো। তবে তার জ্ঞান রয়েছে পুরোমাত্রায়। আমাকে দেখে অস্বাভাবিক ভাবে হেসে উঠল। বললো, 'রাগ হলো, তাই না? কি করবো, একটু খেয়ে এলাম। উপায় ছিল না।'

'উপায় তোমার কোনোদিনই হবে না, নবাবজাদা।'

'তুমি অমনভাবে বলো না লুৎফা, তাহলে দাঁড়াবো কোথায়?'

'আমার মৃতদেহের ওপর। নিজের পায়ে তুমি বেশ ভালোই দাঁড়াতে পারো, অন্যের প্রত্যাশা করো না। ওটা শুধু মুখের কথা।'

'তুমিও একথা বললে?' সিরাজ আশাহত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

'কথাটা সত্যি বলিনি?'

'না লুৎফা। মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে।'

'শরাব খেয়েছো তাই মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে এখন। শরাব খাবার আগে একবার ভেবে দেখো, দেখবে আমার কথাই সত্যি।'

সে ধীরে ধীরে দরজার দিকে ফিরে যায়।

'কোথায় যাচ্ছো?'

'জানি না।'

'এখন যাওয়া হবে না।'

সে হেসে ওঠে। কেমন ভাঙা-ভাঙা হাসি। আরও দু' পা অগ্রসর হয়। আমি গিয়ে তাকে ধরে ফেলি।

'ধরলে কেন? যেতে দেবে না? আমি তো শুধু ছলনা করি।'

'আমার কর্তব্য রয়েছে।'

'কর্তব্য? কর্তব্য তো জারিয়াদেরও আছে। আমি আদেশ করলে একশো জারিয়া ছুটে এসে আমার সেবা করবে, যেমন আজ আমার ছোট্ট আদেশে হোসেন কুলিখাঁর মাথা দেহ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ল।'

'সত্যি?'

হ্যাঁ সত্যি। নির্মম সত্যি। মুর্শিদাবাদের যে-কেউ জানে। সবাই যা জানে, তুমি জানো না? আশ্চর্য!'

'না-না, তা হতে পারে না। তুমি কখনো একাজ করতে পারো না। তুমি ভুল বকছো, শরাবের নেশায় যা-তা বলছো।'

'না লুৎফা, ভুল নয়। আমি নিজেই জানতাম না যে, একাজ আমি করতে পারি, কিন্তু করলামও তো।'

'কেন করলে নবাবজাদা? সেদিন যে তুমি অন্য কথা বললে।' অবাধ্য জল আমার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

'এখনো আমার নিজের মতও তাই, কিন্তু আমি অক্ষম লুৎফা। আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে। অনুশোচনায় তাই শরাব খেয়েছি। খুব বেশি করেই খেয়েছি। তবু শান্তি পাচ্ছি কই? তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম লুৎফা। তুমি তো শান্তি দিয়েছো কতবার, কিন্তু এবার তাও হলো না। আমি ছলনা করি।'

'ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো। অভিমান হয়েছিল—অভিমানও কি করতে নেই?'

'অভিমান করা আমি পছন্দ করি লুৎফা। কিন্তু বড় অসময়ে করেছিলে।'

'কেন তুমি এই সাংঘাতিক আদেশ দিলে সিরাজ?'

'দাদি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে না পেয়ে নিজে গিয়েছিলেন। হাজার কথা বলে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। এ হত্যার জন্যে দাদি দায়ী, আমি নই। কিন্তু লোকে তো জানবে না। বদনাম আমারই হলো। নবাব হবার আগেই আমার নামের সঙ্গে কলঙ্ক জুড়ে দিলাম। বড় আপশোষ হয় লুৎফা।'

আমি চুপ করে শুনি। সে বলে, 'হোসেন কুলিখাঁ সবার প্রিয় ছিল। সে আমারও প্রিয় ছিল। আমি যখন তাকে হত্যা করার আদেশ দিলাম সে বিশ্বাস করতে পারেনি। অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়েছিল। কিন্তু অবাকের রেশ না কাটতেই তার মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কেয়ামতের দিনে এজন্যে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে।'

সিরাজকে শুইয়ে দিয়ে তার পাশে বসি। মনের ভেতরের সংঘাতে সে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে—সে চায় সান্তনা। আমি সান্ত্বনা দিতে যাই, কিন্তু পারি না। মুখে কথা আসে না। ভাবি, সিরাজের কথায় অত বড় একজন লোক হত হলেন। তার মুখের সামান্য একটা কথায় হোসেন কুলিখাঁ জগৎ থেকে চিরবিদায় নিলেন। তাঁর অপরাধ এই যে, তিনি দু'জন বিকারগ্রস্ত নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। হয়তো তাঁর নিজের কোনো দুর্বলতাই ছিল না। নারীরা তাঁকে বাধ্য করেছে নিজেদের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়ে নিতে।

সিরাজ ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি উঠি। বেগমসায়েবার ঘরে যেতে হবে। তাঁকে সোজা প্রশ্ন করবো, কেন তিনি সিরাজকে দিয়ে এ কাজ করালেন? তাঁর হাতে অগাধ ক্ষমতা। একটা লোকের দেহ বিচ্ছিন্ন করতে তিনি সহস্র লোককে পেতে পারতেন। তবে কেন একজন ছেলেমানুষকে প্ররোচিত করে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন তিনি!

বেগমসায়েবার ঘরে তখন অন্য কেউ ছিল না। আমাকে দেখে উঠে বসেন তিনি।

'এসো লুৎফা।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

'জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই। সিরাজ ঠিক কাজই করেছে।'

'কিন্তু....'

'কোনো কিন্তু নয়। নবাব হলে এর চেয়ে আরও অপ্রিয় কাজ তাকে করতে হবে। এখন থেকে

অভ্যাস করুক। শক্ত হয়ে উঠুক।'

'অসহায় লোককে হত্যা করা শক্ত হবার একমাত্র পথ নয়। বরং তাতে অন্য ফল ফলতে পারে।'

'বেশ কথা বলতে শিখেছো তো এর মধ্যেই।'

'বাধ্য হচ্ছি বেগমসায়েবা। নবাবজাদার ভার নিতে আপনিই বলেছিলেন। তাঁব মঙ্গল-অমঙ্গলের দিকে তাকাতে হবে বৈকি। এ যে আপনারই আদেশ।' তাঁকে এভাবে বলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যে কোনো লোকের পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু আমি তখন মরিয়া।

'হুঁ। এতে তার অমঙ্গল কোথায় দেখছো?'

'শত্রুপক্ষ তাঁর নামে কি রটায় আপনি জানেন? এতে সেটা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রজারা জানলো, রটনাটা মিথ্যে নয়।'

'সেক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে নির্মূল করতে হবে।'

'তাহলে মহলের ভেতর থেকেই যে শুরু করতে হয়।'

'বুঝলাম না তোমার কথা।' বেগমসায়েবার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

'শত্রুপক্ষ মহলেও রয়েছে বেগমসায়েবা।'

'কে সে?'

'ঘসেটি বেগম। নবাবজাদার যেসব দুর্নাম রটে তার জন্যে তিনিই দায়ী।'

'প্রণাম আছে?'

'আছে। আমি যোগাড় করেছি। তবে আমি আপনার সামনে সে-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবো না।'

'কেন?'

'দু' চারজন নিরপরাধী তাতে শাস্তি পাবে।'

'হুঁ। তোমার কথা মেনে নিলেও ঘসেটির বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে দেবো না। মনে রেখো লুৎফা, সে আমার মেয়ে। একটা বেগম মরলে সিরাজ হাজারটা বেগম এনে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে, কিন্তু একটা মেয়ে মরলে মেয়ে ফিরে পাওয়া যাবে না।'

'সব আমি জানি, বেগমসায়েবা। প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সেজন্যে আপনাকে এতদিন কোনো কথা বলিনি।'

'সিরাজ কোথায়?'

'আমার ঘরে।'

'সে তোমার ঘরে কি রোজই যায়?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা যাও।'

তাড়াতাড়ি চলে আসি নিজের কক্ষে। বেগমসায়েবার কথার গূঢ় অর্থ আমি বুঝেছি। তিনি আমার কাছ থেকে সিরাজকে সরিয়ে নিতে চান। কিন্তু কিছুতেই আমি দেবো না সিরাজকে। কিছুতেই নয়। বাংলার বেগম বুঝুক লুৎফাও কম নয়, তারও শক্তি রয়েছে।

নিদ্রিত সিরাজকে ঠেলে তুলি। তার কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করি। কান্না ছাড়া গতি নেই।

'কি হলো লুৎফা।'

'তুমি আমাকে একটা দাও।'

'হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে এমন কি কথার প্রয়োজন হলো?'

'বলো দেবে? না দিলে আমি আত্মহত্যা করবো।'

'দেবো, বলো।'

'তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না—কোনোদিনও না।'

'আমি তো দূরে যাইনি।'

'ভীষণ ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমার কাছে তারা তোমাকে থাকতে দেবে না।'

'সে-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।'

'যদি বেগমসায়েবা নিজে থাকেন সে-ষড়যন্ত্রে?'

'তুমি বলছো কি লুৎফা?'

'ঠিকই বলছি।' বেগমসায়েবার সঙ্গে আমার কথোপকথনের সবটুকুই বলি তাকে।

'ঘসেটি বেগম যে এর মধ্যে আছে, সে প্রমাণ তুমি পেলে কি করে?'

'ভাগ্যক্রমে।'

'কি সে প্রমাণ?' তার কথায় আগ্রহ।

'রাজবল্লভের কাছে মীর নজরালি মারফত এক টুকরো চিঠি যাবার কথা ছিল। সেটা আমার হস্তগত হয়েছে।'

'ঘসেটি বেগম লিখেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার হাতে এলো কিভাবে?'

'তোমার দিকে চেয়ে মহলের কিছু লোককে হাতে রেখেছি। অন্যায় হয়েছে নবাবজাদা?'

সিরাজ কিছু বলে না। আমি উঠে গিয়ে ঘসেটির হস্তাক্ষর নিয়ে এসে তার সামনে মেলে ধরি ঃ

'নবাব আলিবর্দি আর কতদিন বাঁচবেন। এরপর কি ওই উদ্ধত বালকের অধীন হতে মনস্থ করেছেন?

সিরাজ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমার ভালো করতে গিয়ে মস্ত ভুল করে বসে আছো লুৎফা। চিঠিখানা যে ঠিক জায়গায় পৌঁছায়নি, সেটা বুঝতে ঘসেটি বেগমের বেশি দেরি হবে না। ফলে কয়েকজন হতভাগ্য শাস্তি পাবে। ঘসেটি বেগম আরও অনেক সাবধান হবে। তার পরবর্তী কার্যকলাপ জানতে পারবো না।'

'এতক্ষণে রাজবল্লভের কাছে চিঠি পৌঁছে গিয়েছে, নবাবজাদা।'

'কি করে?'

'এর নকল করে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। ঘসেটি বেগমের আসল হস্তাক্ষর রেখে দিয়েছি নিজের কাছে।'

সিরাজ আমাকে চুমু খায়। হোসেন কুলিখাঁকে হত্যা করে অবসাদে তার মন ভেঙে গিয়েছিল। সে অবসাদ বিন্দুমাত্রও দেখা গেল না তার মধ্যে। সে আমাকে শূন্যে তুলে বলে, 'তুমি আমার লুৎফাউন্নেসা।'

হঠাৎ তার আনন্দে ভাটা পড়ে। সে আমাকে নামিয়ে দিয়ে দরজার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চায়। মীর্জা ইরাজ খাঁর কন্যা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে আগুন জ্বলছে, মুখ রক্তাভ। হিংস্র জন্তুর মতো সে সিরাজের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভাবি, বেগমসায়েবার ষড়যন্ত্র কি এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল?

সিরাজ বলে, 'এ তোমার অনধিকার প্রবেশ জেবউন্নেসা।'

'না।' ইরাজ-দুহিতার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

'কেন নয়?'

'লুৎফাকে তুমি শাদি করোনি, আমাকে শাদি করেছিলে। দিনের পর দিন একা থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। পঞ্চাশবার লোক পাঠিয়েছি তোমার খোঁজে, তবু পাইনি। তাই আজ নিজেই এসেছি ঘর ছেড়ে। তোমার জন্য যেখানেই যাই না কেন, সেটা অনধিকার হতে পারে না।'

জেবউন্নেসার জন্যে দুঃখ হলো। সত্যিই তো, তার মনেও সাধ আছে, আহ্লাদ আছে। তাছাড়া আমার মতো জারিয়া থেকে সিরাজের এক কথায় বেগম হয়নি সে। ভালো বংশের মেয়ে। রীতিমতো জাঁকজমক আর অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার শাদি হয়েছিল। সে কেন অবহেলা সহ্য করবে?

আমি গিয়ে তার হাত ধরি। সে হাত ছাড়িয়ে নেয়, বলে, 'ছুঁয়ো না। তোমার হাত আমার দেহ স্পর্শ করবার উপযুক্ত নয়। ও হাতে আমার পা টিপতে পারো।'

লজ্জায় অপমানে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে আমার। সিরাজ হো-হো করে হেসে বলে, 'কিন্তু ও হাতের স্পর্শ যে আমার সর্বাঙ্গে। আমার দেহ কি তুমি ছুঁতে পারবে, জেবউন্নেসা?'

সে কোনো কথা বলে না।

আমি বলি, 'নবাবজাদাকে তোমার ঘরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'থাক দয়া দেখাবার প্রয়োজন নেই। আমার কাজ আমি নিজেই করে নিতে জানি। কেউ যদি তাতে বাধা সৃষ্টি করে তাকে কিভাবে সরিয়ে দিতে হয় তাও আমার জানা আছে।'

'ও, জানো নাকি?' সিরাজের মুখে বিদ্রূপের তারল্য। আমি দু'হাতে তার মুখ চেপে ধরি।

সিরাজ এগিয়ে যায় জেবউন্নেসার কাছে। দুই হাতে তার হাত দুটো তুলে নিয়ে নিজের গলায় মালার মতো রেখে বলে, 'শুধু শুধু রাগ করছো তুমি। লুৎফাকে শাদি করিনি যখন, তখন সে তোমার অধিকার কি করে ছিনিয়ে নেবে?'

'থাক, আর মন ভোলাতে হবে না।' জেবউন্নেসা সিরাজের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

'বিশ্বাস করলে না? এই দেখো।' সিরাজ নিজের গলা থেকে একটা বহুমূল্য হার খুলে নিয়ে বলে, 'এর মূল্য নবাবের অর্থভাণ্ডারের প্রায় অর্ধেক অর্থের সমান। লুৎফা কোনোদিন এ-হার পেতো না, অন্য কোনো বেগমও নয়, কিন্তু তুমি পেলে। তুমি যে আমার শাদি করা বেগম, জেবউন্নেসা।'

সিরাজ সযত্নে সে-হার পরিয়ে দেয় তার গলায়।

জেবউন্নেসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে চঞ্চল হয়। এ যেন তার কল্পনার অতীত। বিস্মিত হয়ে বলে, 'আমাকে একেবারে দিয়ে দিলে!'

'হ্যাঁ, এতে যে শুধু তোমারই অধিকার। হাজারটা লুৎফা এসে শতবর্ষ ধরে চেষ্টা করলেও এ জিনিস পেতো না।'

সিরাজ তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে সিরাজের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে হাসতে হাসতে ছুটে চলে যায়।

হো-হো করে হেসে ওঠে নবাবজাদা। আর আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি। এই বয়সে এত বুদ্ধি বুঝি শুধু নবাবদেরই হয়। নারী-চরিত্র চিনতেও তার বাকি নেই। নিজে নারী বলে লজ্জিত হই।

সিরাজ বলে, 'জেবউন্নেসা তার অধিকার বুঝে পেয়েছে, লুৎফা। তোমাকে দিলাম না বলে কষ্ট হলো না তো?'

'কিছুমাত্র নয়। আমার বহুমূল্য হার আমার সামনে দাঁড়িয়ে। জেবউন্নেসা নকল হার নিয়েই ভুলল। সে মূর্খ।' সিরাজের হাত দুটো তুলে নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে দিই।

যে অসন্তোষ সিরাজের মনে অল্প-অল্প ধূমায়িত হচ্ছিল, সেটা প্রচণ্ড আকারে দেখা দিল একদিন।

মেহেদি নেশারখাঁ দিনের পর দিন ইন্ধন যুগিয়ে এ দশা করলো। গোড়া থেকে জেনেও আমি বাধা দিতে পারলাম না।

বহুদিন থেকে সিরাজ জেদ ধরেছিল, সে পাটনায় গিয়ে থাকবে। কিন্তু নবাব আলিবর্দি বার বার বুঝিয়ে তাকে শান্ত করেছেন। এখন নবাব মুর্শিদাবাদে নেই। ছোটখাটো একটা যুদ্ধ বেধেছে রাজ্যের সীমান্তে, তিনি সেখানে গিয়েছেন।

নবাবের অনুপস্থিতিতে মেহেদি নেশারখাঁ পরিপূর্ণ সুযোগ পেলো। সিরাজের মনে সে ধারণা এনে দিল যে, নবাব সিরাজকে তুষ্ট রাখার জন্যে নামে শুধু তাকে পাটনার শাসনকর্তা করেছেন, আসলে প্রকৃত শাসনকর্তা রাজা জানকীরাম।

কথাটা সিরাজ অনেকবার আমাকে বলেছে, আমি কোনো গুরুত্ব দিইনি। বরং আকারে, ইঙ্গিতে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, সে বাংলার মসনদে বসবে বলেই নবাব তাকে দূরে না পাঠিয়ে নিজের কাছে রাখতে চান। এতে অভিজ্ঞতা লাভ হবে। পাটনায় গিয়ে বসে থাকলে মুর্শিদাবাদের রাজনীতি সম্বন্ধে সে অজ্ঞ থেকে যাবে। তাছাড়া সেখানে বিপদও আছে অনেক। তার পিতা জীবন দিয়ে সে প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু সিরাজ নাছোড়বান্দা।

হঠাৎ একদিন আমার কাছে তার আদেশ এলো, শিগ্‌গির প্রস্তুত হয়ে নিতে। কেন প্রস্তুত হবো, কোথায় যাবো, কিছুই না বুঝে যখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমিনা বিবি তখন কাঁদতে কাঁদতে এসে বলেন, 'শুনলে সিরাজের কাণ্ড!'

'কিছুই বুঝছি না।'

'ওর সঙ্গে যেতে হবে পাটনায়।' পাটনা আক্রমণ করবে।

'সে কি!'

'আর বলো কেন? কে কি বুঝিয়েছে জানি না, গোঁ ধরে বসেছে।'

'আপনিও যাবেন নাকি?'

'নইলে আর বলছি কি!'

'ভালোই হলো। আমি ভেবেছিলাম আমাকেই বুঝি একা যেতে হবে।'

'আমি মা'র কাছে চললাম। অতদূরে আমি আর যেতে পারবো না। সে কি কম দূর?'

'বেগমসায়েবার কাছে গেলে কি কোনো ফল হবে?'

'দেখি, মা যদি ওকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারেন।' আমিনা বিবি চলে যান।

আমি জানি, কারো কথাতেই কিছু হবে না। আমাদের দুজনকেই যেতে হবে সিরাজের সঙ্গে। গোছগাছ করে নিই।

সামনে আর পেছনে সৈন্যের দল। তারই মাঝে চলেছে বলদদের গাড়ির সারি। মেহেদি নেশারখাঁ সামনের গাড়িতে রয়েছে। পরের গাড়িতে আমি আর সিরাজ। তার পরের গাড়িতে আমিনা বিবি। বেগমসায়েবার কাছে ধর্না দিয়েও তিনি মুর্শিদাবাদে থাকতে পারেননি।

আমিনা বিবির পরে আরও দু'খানা গাড়িতে রয়েছে জিনিসপত্র।

পথ আর শেষ হতে চায় না। একটু পরেই গলা শুকিয়ে ওঠে। জল খেয়েও তৃষ্ণা মেটে না।

'কোথায় নিয়ে চললে, নবাবজাদা? পৃথিবী যে শেষ হয়ে এলো।'

'এখনো কষ্ট শুরু হয়নি, লুৎফা। প্রকৃতির শ্যামল রং দেখতে পাচ্ছো এখনো। এরপর শুরু হবে শুধু পাহাড় আর শক্ত মাটি।'

'আমি মরে যাবো, নবাবজাদা।'

'এত অল্পেই? যুদ্ধ শুরু হলে কি করবে?'

'যুদ্ধে কাজ নেই। এ তুমি জোর করে যুদ্ধ বাধাচ্ছো। চলো, ফিরে যাই।'

'চুপ। বাজে কথা শুনতে চাই না। আত্মসম্মান কি জিনিস তা বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই।'

'এ আত্মসম্মান-বোধের ভিত্তিটা মিথ্যের ওপর।'

'আর কথা হলো না, গাড়ি থেকে ফেলে দেবো।' সিরাজের মুখের দিকে চেয়ে ভয় হলো। তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যে ভূত ঘাড়ে চেপেছে, সেটা না নামা অবধি একটু সাবধানে কথা বলতে হবে। অন্তত তার পাটনা অভিযান সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা চলবে না আর।

শেষে পথ ফুরোলো।

দূর থেকে দেখা যায় আজমবাগের দুর্গ। কিন্তু ও-পক্ষের যুদ্ধের কোনো আয়োজন তো দেখা যাচ্ছে না। সিরাজ খুবই বিস্মিত হলো। সে গাড়ি থেকে মাটিতে নামে। পর্দা সরিয়ে দেখলাম, মেহেদি নেশারখাঁ গাড়ি থেকে নেমেছে। কোনো গভীর পরামর্শ করতে করতে দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে।

পাটনার প্রধান দরজার সামনে আমাদের সমস্ত সৈন্য দাঁড়িয়ে গেল। দরজা বন্ধ। একজন লোক শুধু একটা চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার বাইরে। রাজা জানকীরামের চিঠি।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সিরাজ মত্ত হাতির মতো ঘুরে বেড়াতে থাকে। জানকীরাম তাকে অপমান করেছে। লিখেছে যে, সিরাজ পাটনার শাসনকর্তা। সে একা এলে জানকীরাম তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। যথাযথ সম্মান দেখিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে নগরীর ভেতরে। কিন্তু সৈন্যসামন্তকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সৈন্যরা যেন ফিরে যায় মুর্শিদাবাদে।

সিরাজ ক্রোধে চীৎকার করে উঠল। সৈন্যদের ডেকে আক্রমণ চালাতে বললো। কিন্তু আক্রমণ করবে কাদের ওপর? বিপক্ষের তো কোনো সৈন্য নেই।

শেষে নগরীর দরজা ভেঙে ফেলার হুকুম দিল সে। সেই সময় সর্বপ্রথম বাধা পেল অপর পক্ষ থেকে। যারা দরজা ভাঙতে গিয়েছিল, তাদের কিছু লোক তীরের আঘাতে ধরাশায়ী হলো।

এবার মেহেদি নেশারখাঁ এগিয়ে যায় অর্ধেক সৈন্য নিয়ে। দরজা ভাঙতেই হবে, এই হলো সিরাজের পণ। তার মুখে হাসির আভাস দেখা গেল। ভাবখানা এই যে, জানকীরামের ওপর টেক্কা দিয়েছে সে। তীরের আঘাতে দু'চারজনকে মেরে ফেলে ভাবে, এবারে আর জানকীরাম পাটনা নগরী রক্ষা করতে পারবেন না।

কিন্তু মেহেদি নেশারখাঁ দরজার কাছে এগিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ দেখা গেল, অজ্ঞাত স্থান থেকে একদল সৈন্য এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। বহুক্ষণ কিছু বুঝতে পারলাম না—শুধু অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি আর ঝলকানি। আমি আর আমিনা বেগম শিবির থেকে এই ভয়াবহ কাণ্ড দেখি, আর ভেবে মরি। আর সিরাজ আমাদেরই সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করে। কি যেন ভুল হয়ে গিয়েছে তার—মস্ত ভুল।

একজন ছুটে এসে বলে, 'মেহেদি নেশারখাঁ হত হয়েছে।' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সিরাজ। আর আমার বুক থেকে পাষাণভার নেমে যায়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, রাজা জানকীরামের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই নেই। শুধু নগরী রক্ষার জন্যে যেটুকু না করলে নয়, সেটুকু করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁর সৈন্যদের। অজ্ঞাতস্থান থেকে তাঁর সৈন্যদল যেভাবে মেহেদি নেশারখাঁর সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, ইচ্ছে করলে ওভাবে আমাদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো। কিন্তু পড়েনি। কারণ জানকীরামের আদেশ নেই। সিরাজ যাতে নিরাপদে থাকে, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে।

মেহেদি হত হবার পর সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ হলো। সিরাজ রীতিমতো চিন্তিত হয়েছে। সে অন্য কোনো কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় রয়েছে।

পরদিন একজন অশ্বারোহী আমাদের শিবিরের সামনে এসে হাজির হয়। নবাব আলিবর্দির ঘোড়সওয়াবকে দেখে বিস্মিত হলাম। লোকটি সোজা এসে সেলাম দিয়ে সিরাজের সামনে দাঁড়াল।

'কোথা থেকে আসছো?' সিরাজ প্রশ্ন করে।

'নবাব পাঠিয়েছেন।'

'তিনি জানলেন কি করে যে, আমি এখানে এসেছি?'

'রাজা জানকীরাম তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন।'

'হুঁ, স্পর্ধা বটে জানকীরামের।'

লোকটাকে সিরাজ মেবে না ফেলে।

'নবাব কি জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছেন?' কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে সিরাজ প্রশ্ন করে।

লোকটি একখানা চিঠি দেয়।

সিরাজ বার বার সেটা পড়ে। তার মুখে আস্তে আস্তে একটা শান্ত ভাব ফুটে ওঠে। শেষে সারা মুখ জুড়ে হাসির রেখা দেখা দেয়। আমি স্বস্তি পাই। নবাব তাঁর নাতির মন ভালোভাবেই জানেন। সেই মন বুঝে তিনি কিছু লিখেছেন নিশ্চয়। নইলে সিরাজের মুখে এই পরিস্থিতিতে হাসি ফোটানো বড় সহজ কথা নয়। বৃদ্ধ হলেও নবাব আলিবর্দির তুলনা নেই।

সিরাজ চিঠিখানা নিজের সামনে রেখে লোকটির দিকে চেয়ে বলে, 'নবাবকে নিশ্চিন্ত হতে বলো। তাঁর ইচ্ছেমতোই কাজ হবে।'

লোকটি বিদায় নিতেই আমি সিরাজের সামনে আসি। আমাকে দেখে সে বলে, 'দেখছো লুৎফা, দাদুর কাণ্ড।'

'কি কাণ্ড হলো আবার?'

'দাদুর জন্যে আমার কোনো কিছু করবার উপায় নেই। তিনি ভাবেন, যেন চিরকাল বেঁচে থেকে আমাকে বুকে করে নিয়ে বেড়াবেন।'

'অমন দাদু পাওয়া ভাগ্য, নবাবজাদা।

'সে আমি জানি। কিন্তু আমার সব কাজকে ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেওয়া তাঁর অন্যায়। এবারে মুর্শিদাবাদে গিয়ে আমি ঝগড়া করবো—ভীষণ ঝগড়া করবো, তুমি দেখে নিও।'

'যাক্, তাহলে আর আমাদের পাটনায় থাকতে হবে না তো?'

সিরাজ ঘাড় নাড়ে।

অভিমান হয়েছে নাতির। মুখে বলি, 'নবাব তোমাকে কি লিখেছেন?'

'এই দেখো।'

চিঠিখানা খুলি। লেখা রয়েছে ঃ 'যুদ্ধ করে সবাই বীরত্ব দেখাতে পারে, কিন্তু দাদুর ভালোবাসার অত্যাচার যে সহ্য করতে পারে, সেই তো প্রকৃত বীর। আমার সিরাজ সে রকম বীর কিনা তারই পরীক্ষা আজ। জানকীরাম তোমার শুভাকাঙ্খী। সে তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত। শুধু তোমার আদেশের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। নিজের সৈন্যের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করে নাকি? জানকীরাম তো তোমারই অধীনস্থ কর্মচারী। তাকে শুধু হুকুম করো।'

আমি বলি, 'নবাব তো ঠিকই লিখেছেন। রাজার কাছে লোক পাঠাও এখুনি।'

কিছুক্ষণ পরেই জানকীরাম স্বশরীরে এসে উপস্থিত। সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, পালকি আর বাদ্যযন্ত্র।

সিরাজ হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে রাজাকে জড়িয়ে ধরে। রাজাও হেসে দু' বাহু বাড়িয়ে দেন। সে দৃশ্য দেখে আমার চোখ আনন্দে সজল হয়ে ওঠে। এমন সৌম্য চেহারার লোকের বিরুদ্ধে সিরাজ অভিযান চালিয়েছিল ভেবে লজ্জা হয়। তাঁর মতো এলেমওয়ালা লোক নবাবের অধীনে হয়তো দু'জনও নেই।

নবাব আলিবর্দির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তাঁর ঋজু বলিষ্ঠ চেহারা নুইয়ে পড়ল। বেগমসায়েবা রীতিমতো চিন্তিত হন। হাকিমদের মতামত শুনে তাঁর মতো মহিলার মুখও শুকিয়ে যায়।

কিন্তু নবাব শুনে হেসে বলেন, 'এতে এত মনমরা হবার কি আছে? এই তো নিয়ম। স্বাস্থ্য একদিন সবারই ভেঙে যায়। তারপর ধীরে ধীরে শেষ সময় ঘনিয়ে আসে। এর জন্যে কান্নাকাটি করা বাতুলতা। বরং মনকে শক্ত করে প্রস্তুত থাকাই ভালো।'

বেগমসায়েবা বলেন, 'এমন কথা বলো না, তোমার বয়স এমন কিছু বেশি নয়।'

নবাব হেসে বলেন, 'তোমার কাছে আমি কি কখনো বুড়ো হই? বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করো তাহলে বুঝবে।'

তাঁর কথার ধরণে আমি গোপনে হেসে ফেলি। সে হাসি বেগমসায়েবা দেখে ফেলেন। বুঝতে পারি তিনি রেগেছেন। ভয়ে আমি পালিয়ে যাই। মনে মনে ভাবি মেয়েরা বড় অবুঝ হয়। সিরাজ যখন বুড়ো হবে, তখন আমিও হয়তো বেগমসায়েবার মতোই ভাববো।

এখন সিরাজই সব কাজ চালায়। নবাব শুধু পরামর্শ দেন। সিরাজকে তিনি বলেন, 'ভালোই হলো রে দাদু, হাতেনাতে শিখে নে। এমন সুযোগ আর ক'জন পায়?'

'এমন শেখায় আমার কাজ নেই।' সিরাজের চোখ ছলছল করে।

'সেকি রে, তুইও কাঁদছিস? হা আল্লা! এমন নরম মন নিয়ে নবাব হবি?'

'আমি কাঁদছি কে বললে? রাগলে আমার চোখে জল আসে।'

'আবার রাগ হলো কেন?'

'হবে না? স্বাস্থ্য তোমার একটু খারাপ হয়েছে। এমন হয়েই থাকে। তাতে অত মরার কথা কেন? ঘুরেফিরেই তো বেড়াচ্ছো। শয্যাশায়ী হলেও না হয় কথা ছিল।'

'রোগটা বড় খারাপ রে! এই যে পা দেখছিস, কেমন ফোলা-ফোলা ভাব, হাকিমরা বলে, এই পা পচে উঠবে।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। বর্গীর সঙ্গে যুদ্ধের ফল। হাঁটুর নিচেটা কেটে গিয়েছিল। একজন অচেনা হাকিম এসে কতকগুলো লতাপাতা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল জায়গাটা। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে ব্যথা হয় আর ফুলে যায়।'

'ভালো করে চিকিৎসা করাও।'

'চিকিৎসা গোড়া থেকেই হচ্ছে। এখন চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছে যে। তাই তো বলি, শিখে নে।'

সিরাজ গম্ভীর হয়ে বসে থাকে।

ঘসেটি হঠাৎ একদিন নবাব মহল ছেড়ে চলে যায়। সে মতিঝিলে গিয়ে ওঠে। সেখানেই বসবাস করবে।

মুর্শিদাবাদের বেহেস্ত মতিঝিল। একবার শুধু গিয়েছিলাম সেখানে। কিন্তু সে-ছবি এখনো আমার

মনের মধ্যে তেমনি স্পষ্ট, তেমনি উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি মতিঝিলকে। তার সাজানো বাগিচা আর অশ্বপদক্ষুরাকৃতি ঝিল যেন বেহেস্তের মায়া রচনা করে স্বপ্নের মধ্যে। আবার দেখবার ইচ্ছা হয়েছে কতবার, কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ঘসেটি বেগম সেই মতিঝিলকে নিজের করে নিলো।

ইরাজ খাঁর কন্যা ভীষণ চটে গেল একথা শুনে। সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল, ঘসেটির অধিকার নেই মতিঝিলে বাস করবার। ওটা নবাবের প্রমোদ উদ্যান—খাস নবাবের অধীনে। ইরাজ খাঁর কন্যা হয়তো ভুলে গিয়েছিল যে, সিরাজ সবকিছু করলেও বাংলার মসনদে এখনো নবাব আলিবর্দিই রয়েছেন। তিনি যদি তাঁর কন্যাকে মতিঝিল দান করেন, কারও ক্ষমতা নেই কিছু বলার।

সিরাজ এসে বলে, 'আমি এ রকমই অনুমান করেছিলাম, লুৎফা।'

'কিসের অনুমান?'

'নওয়াজিস আর ঢাকায় থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'সে হয়তো থাকতো সেখানে, কিন্তু ঘসেটি বেগম তাকে থাকতে দেয়নি। টেনে নিয়ে এসেছে মুর্শিদাবাদে।'

'এখানে টেনে নিয়ে এসে লাভ?'

'তুমি বড় অল্প বোঝো, লুৎফা।'

'আমাকে বুঝিয়ে দেবে না?'

'দেবো। দাদু অসুস্থ। ভালোমন্দ একটা কিছু যখন তখন হতে পারে। শেষ চেষ্টা করতে হবে না?'

'কিসের চেষ্টা, নবাবজাদা?'

'নাঃ, তোমাকে খুলে না বললে হবে না দেখছি।'

'খুলেই বলো।'

'ঘসেটি বেগম নওয়াজিসকে নবাব করার শেষ চেষ্টা করবে একবার।'

'কি সর্বনাশ!' আমার গলা কেঁপে ওঠে।

'এতে আর সর্বনাশের কি হলো? সবাই এমন করে থাকে। আমি নবাব না হতে পারলে আমিও করতাম। ঘসেটির দোষ কি হবে? সব দেশের মসনদের সঙ্গেই এ রকম ইতিহাস জড়িত। নতুনত্ব কিছু নেই। তবে ঘসেটি একটু বাড়াবাড়ি করছে। রাজবল্লভ আর জগৎশেঠকে দলে টানার চেষ্টা করছে। রাজবল্লভ বড় চতুর লোক। ঢাকায় নওয়াজিসের সমস্ত ক্ষমতা সে নিজের মুঠোয় নিয়েছে। নওয়াজিসকে নবাব করতে পারলে, সেই হবে প্রকৃত নবাব। কিন্তু তবু তাকে আমি এতটা ভয় পাইনে, যতটা পাই জগৎশেঠকে। ও লোকটা যদি ঘসেটির দলে যায়, তাহলে টাকা পয়সা দিয়ে অনেক কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে।'

'সে রকম ঘটনা যাতে না ঘটে এখন থেকে সেই চেষ্টা করো।' আমি উৎকণ্ঠিত হই।

'চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। ওরা ভোলবার পাত্র নয়।'

'মীর বক্‌সীকুলের খবর কি?' তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আমার কানে আসছিল।

সিরাজ বিস্মিত হয়ে বলে, 'তুমি কি করে জানলে!'

'হারেমে থাকলে কি কিছুই জানতে নেই?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'বেগমসায়েবা তো সব জানেন।'

'দাদি অন্য ধাতুতে গড়া।'

'আমিও সেই ধাতুতে নিজেকে ডুবিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।'

সিরাজ হেসে বলে, 'ভালো। পারলে সত্যিই ভালো। জাফর আলি খাঁর ওপর আমার নজর আছে, লুৎফা।'

'কিন্তু.....'

'ওসব কথা থাক্। এখন একটা কাজের কথা বলি। মতিঝিল তো নওয়াজিস খাঁ নিয়ে নিল। আমার ও রকম একটা ঝিল না হলে যে চলবে না।'

'কি করে নেবে ওটা?'

'ওটা নেবার দরকার নেই। আমি নতুন ঝিল তৈরি করবো নদীর ওপারে।'

'টাকা?'

'সে ব্যবস্থা করতে হবে। আদত কথা হলো দাদুর সম্মতি আদায় করা। সেটা হয়ে গেলে টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। এই পুরোনো জায়গায় থাকতে ইচ্ছা হয় না, লুৎফা। নতুন জায়গায় গিয়ে থাকবো শুধু তুমি আর আমি।'

'কবিত্বটা কি ঘসেটি বেগমের ওপর ঈর্ষাবশে?'

'না, অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে সাধ ছিল। মতিঝিল বেদখল হওয়ায় মনের সেই সাধ তাড়াতাড়ি বাস্তব রূপ নেবে।'

'তোমার ঝিলের নাম কি রাখবে?'

'লুৎফা-ঝিল।' সিরাজ হেসে ওঠে।

'না-না, আমি ঝিল হতে চাই না। আমি নির্জলা লুৎফাই থাকতে চাই।'

'সম্রাট সাজাহান মমতাজকে কেমন অমর করে রেখে গিয়েছেন।'

'সাজাহানের পুরুষোচিত বীরত্ব ছিল না বলে ওই পথ ধরেছিলেন।'

সিরাজ আমার কাছ থেকে ঠিক এ জাতীয় জবাব আশা করেনি। তাই কেমন একটা থতমত ভাব দেখলাম তার আচরণে।

আমি এগিয়ে গিয়ে তার বুকে মাথা রেখে বলি, 'আমি চাই না, তুমি আর আমি লুৎফা-ঝিলের মধ্যে বেঁচে থাকি। তার চেয়ে তুমি এমন একজন নবাব হও, যাতে তোমাকে কেউ কোনোদিন না ভোলে। তুমি যদি সেভাবে অমর হও, তাহলে আমি তো তোমার সঙ্গেই বেঁচে থাকবো। আমি যে তোমার প্রাণের আধখানা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিরাজ বলে, 'সেই ভালো লুৎফা, আমি সেইভাবেই অমর হবার চেষ্টা করবো। কিন্তু ঝিলের একটা নাম তো রাখতে হবে।'

'এপারে রয়েছে মতিঝিল, তোমারটা হবে হীরাঝিল।'

'হীরাঝিল! হীরাঝিল! বাঃ, সুন্দর! কী সুন্দর নাম দিলে তুমি! তাই হবে—হীরাঝিল।'

সিরাজ ছুটতে ছুটতে চলে যায়। যেন এখনই তৈরি হয়ে যাবে হীরাঝিল। পাগলের দিকে চেয়ে তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে।

হীরাঝিল তৈরি হয়ে গেল। মতিঝিলের চেয়েও নাকি সুন্দর হয়েছে দেখতে।

মতিঝিলের গর্ব খর্ব করার জন্যেই যেন তারই অপর পারে উদ্ধত সৌন্দর্য নিয়ে গড়ে উঠল হীরাঝিল।

নবাব আলিবর্দিকে সিরাজ একদিন বললো, 'দাদু, একটা কথা আছে।'

'কি হলো আবার?'

'না, হয়নি কিছু। কিন্তু যা বলবো তা কি তুমি মেনে নেবে?'

'অসঙ্গত না হলে মেনে নেবো বৈকি।'

'সেই ভরসাতেই তো এসেছি।'

'ঢের হয়েছে। এখন কথাটা বলেই ফেলো তো ধন।' নবাবের মুখে হাসি।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনি। আমি জানি, সিরাজ কি বলতে এসেছে। যা বলতে এসেছে তাতে আমার মত নেই। তবে ওর উৎসাহ দেখে বাধা দিতে পারিনি। বলেছিলাম, নবাবের সম্মতির প্রয়োজন। তাই সিরাজ এসেছে নবাবের কাছে। আমার ধারণা, নবাব কখনোই সম্মত হবেন না সিরাজের এই আবদারে।

সিরাজ বলে,'হীরাঝিল তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

'শুনলাম। ঘসেটি তো রেগেই আগুন।'

'অনেকেই রাগবে, তার জন্যে কিছু এসে যায় না। আমার দাদু না রাগলেই হলো।'

'এত ভেজা-ভেজা কথা কেন? শুনে যে বড় ভয় হচ্ছে। কি মতলবে এসেছো বলেই ফেলো?'

'আমি হীরাঝিলে থাকবে।'

নবাবের মুখ এতটুকু হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে অসহায় ভাব। কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না, যেন তাঁর বুক শূন্য হয়ে যেতে বসেছে। সিরাজের কথার কোনো জবাব দিতে পারেন না তিনি।

সিরাজ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বলে, 'দাদু, হীরাঝিলে থাকতে আমারও খুব ভালো লাগবে না। কিন্তু এত কষ্ট করে তৈরি করলাম থাকতে সাধ হয়।'

নবাব আরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'হুঁ, বুঝলাম। বেশ, তুমি হীরাঝিলে থাকো, কিন্তু বুড়োর কথাটা মনে রেখো।'

কাজ হাসিল করে নিলেও দাদুর কথা শুনে সিরাজের চোখ সজল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'তোমাকে কষ্ট করে মনে রাখতে হয় না, দাদু। তোমার কথা মনের মধ্যে সব সময়ই গেঁথে থাকে।'

আলিবর্দির মুখে হাসি ফোটে। তিনি বলেন, 'তাই নাকি? আমি জানতাম, বুড়োদের কথা কেউ মনে রাখে না। বুড়োদের স্নেহও লোকে বিদ্রূপের চোখে দেখে। তোমার কথা শুনে যেন বল পাচ্ছি মনে। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে সাধ হচ্ছে।'

'কথায় কথায় অত মৃত্যুর কথা ভাবো কেন? বেশ তো আছো, ভেবে-ভেবেই তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'না ভেবে করি কি? পায়ের অবস্থা দেখেছো?' আলিবর্দি পায়ের ওপর থেকে একটা আলগা কাপড় তুলে নেন। চমকে উঠি দূর থেকে। কী বীভৎস চেহারা হয়েছে পায়ের! সিরাজ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে।

'দেখলে তো? এরপরেও বলবে আমি বেঁচে থাকবো?'

সিরাজ নিশ্চুপ। বলার কিছু নেই তার। দাদুর আয়ু সম্বন্ধে এতদিনে সে প্রথম সচেতন হলো। আরও কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে চলে আসে।

শুধু আমাকেই সিরাজ হীরাঝিলে নিয়ে এলো। অন্যান্য বেগমরা পড়ে থাকলো পুরোনো মহলে। ভেবে সঙ্কুচিত হই আমি। সিরাজকে বলেছিলাম, ওদেরও নিয়ে আসতে। অন্তত ইরাজ খাঁর কন্যাকে। সে শোনেনি।

মাস দুয়েক না যেতেই আর এক সমস্যা দেখা দিল সিরাজের মনে। হীরাঝিল তৈরি করতে জলের মতো টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু তার তত্ত্বাবধানের জন্যেও যে মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন, এ ধারণা তার ছিল না। অসংখ্য ঘরের অপূর্ব মহল তৈরি করে সিরাজ যে-আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, সে এখন

আর-এক গোলকধাঁধায় পড়ে ঘুরতে লাগলো।

'কি করি লুৎফা?'

'আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'এ যে জলের মতো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কি ব্যবস্থা করি?' সে অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। শেষে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলে, 'ঠিক, পেয়ে গিয়েছি।'

'কি পেলে আবার?'

'উপায়।'

'কিসের উপায়?'

'হীরাঝিলকে টিকিয়ে রাখার উপায়।'

'তাই নাকি? শুনতে পাবো কি?'

'উঁহু, এখন না। কালকে নিজের চোখে দেখো। হীরাঝিলের গোলকধাঁধা আমার টাকার উপায় করবে।'

'সে আবার কি কথা? একটা গোলকধাঁধা তৈরি হয়েছে বটে। কিন্তু তাতে অর্থের সমাধান কি করে হবে?'

'এখন কিছুতেই ভাঙছি না। শোনো, কালই দাদুকে নিয়ে আসবো এখানে। সেই সঙ্গে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ সবাই আসবেন। আমার হীরাঝিল দর্শনের আমন্ত্রণ জানাবো তাঁদের।'

'হঠাৎ?'

'বাঃ, কেউ তো দেখেনি এখনো। তাঁদের দেখাতে হবে তো।'

'কিন্তু শুধু কি দেখানোর জন্যে তাঁদের ডেকে আনছো? তোমার চোখে কিসের এক অভিসন্ধি খেলে বেড়াচ্ছে যে।'

সিরাজ হেসে ওঠে, 'ঠিক ধরেছো, লুৎফা। কিন্তু এমন কিছু দুরভিসন্ধি নয়, সামান্য কৌশলমাত্র। কালই জানতে পারবে।'

পরদিন সবাই এলেন। সিরাজ ঘুরে ঘুরে তাঁদের সব দেখাতে লাগলো। ছাদের গুপ্তপ্রকোষ্ঠে বসে আমি দেখতে থাকি। তাঁদের হাবভাব আর হাত নাড়া দেখে বুঝলাম, সবাই খুব বিস্মিত হয়েছেন। নবাব আলিবর্দি খুঁড়িয়ে চলতে চলতেই যেভাবে হাসছেন আর সিরাজের পিঠ চাপড়াচ্ছেন তাতে অনুমান করলাম, তিনি খুশি হয়েছেন। ঝিল দেখার পর বাগিচার মধ্যে অনেকক্ষণ বেড়ালেন তাঁরা। তারপর সিরাজ তাঁদের মহল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সেখানে নিয়ে আসে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গিয়ে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে থাকি। সিরাজ কি কৌশল প্রয়োগ করে দেখার জন্যে উদগ্রীব হই।

সবাইকে সিরাজ গোলকধাঁধার সামনে এনে হাজির করে। সবাই একসঙ্গে যেতে চাইলে সিরাজ বলে, 'আপনারা অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। একে-একে ভেতরে যাবেন। নবাব থেকে শুরু হোক।'

'বেশ, তাই হোক।' নবাব হাসতে হাসতে প্রবেশ করলেন। সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। সিরাজও। অনেকক্ষণ কেটে যায়, কিন্তু নবাব আর ফেরেন না। ওরা সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

রাজবল্লভ প্রশ্ন করেন, 'নবাব ফিরছেন না যে?'

সিরাজ বলে, 'ধাঁধায় পড়েছেন বোধহয়।'

জগৎশেঠ মুখ গম্ভীর করে বলেন, 'তাঁকে বাইরে নিয়ে আসা উচিত। এটা গোলকধাঁধা জানলে আমি কিছুতেই তাঁকে প্রবেশ করতে দিতাম না।'

'উনি নাতির কাছে এসেছেন আনন্দ করতে', সিরাজ বলে।

'তবু বুড়ো মানুষ। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, সেটাও তো ভাবা উচিত।'

'দেখাই যাক না, একা উনি বাইরে আসতে পারেন কিনা। যদি বাইরে আসেন তাহলে এ ঘর আবার ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরি করা হবে।'

ইতিমধ্যে নবাবের উচ্চকণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে কানে ভেসে আসে, 'কই দাদু, আর তো পারি না। এবার বার করে দাও আমাকে। ঘুরতে ঘুরতে যে তেষ্টা পেয়ে গেল।'

'আর একটু চেষ্টা করো।' বাইরে থেকে সিরাজ চেঁচায়।

'অনেক চেষ্টা করেছি, এখন বসে পড়েছি। চেষ্টা করার আগে নবাব আলিবর্দি কথা বলে না।'

'তাহলে তুমি আমার কাছে বন্দী, একথা স্বীকার কর।'

জগৎশেঠ, উমিচাঁদ আর রাজবল্লভ সবাই চমকে ওঠেন। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। রাজবল্লভের কোমরে খরশানণ ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে। সিরাজ সে-শব্দ শুনে একবার বাঁকা চোখে সেদিকে চেয়ে হেসে ফেলে।

ভেতর থেকে নবাবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'তোমার কাছে তো আমি চিরদিনই বন্দী।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বন্দী।'

'মুক্তিপণ দিলে মুক্তি পাবে।'

'কি মুক্তিপণ চাও?'

'হীরাঝিলের আশেপাশের গঞ্জ থেকে যে নজরানা আদায় হবে, সেই নজরানায় হীরাঝিলের খরচ চলবে।'

'বেশ, তাই হবে। এবার ছেড়ে দাও।'

'অত সহজে কি ছাড়া যায়, দাদু। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তো করলে, কিন্তু এখন কি দেবে?'

'এখন আবার কি চাও?'

'বাঃ! এত বড় যোদ্ধা হয়ে যুদ্ধের নিয়মকানুন ভুলে গেলে?'

'তোমার মতলবটা তাড়াতাড়ি বলো, আমার পায়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

সিরাজের ওপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কিছুদিন আগে নবাবের পায়ের যে ভয়াবহ অবস্থা দেখেছিলাম, এখন নিশ্চয়ই তার চেয়ে আরও অবনতি হয়েছে। এই অসুস্থ বৃদ্ধের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর খেলায় কেন যে সে মত্ত হলো?'

সিরাজ বলে, 'যুদ্ধশাস্ত্রে নগদ অর্থই একমাত্র মুক্তিপণ, দাদু।'

'আমার কাছে কিছুই নেই।' নবাবের কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতো শোনায়।

বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁর রাগে কাঁপতে থাকেন। তবু সিরাজ অবিচল।

সে বলে, 'তোমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সঙ্গে কিছু অর্থ রয়েছে নিশ্চয়। তাঁদের বলো।'

'আচ্ছা, তাই বলো তাঁদের।'

যাঁর কাছে যা ছিল, সবাই বার করে দিলেন সিরাজের সামনে। জগৎশেঠ তাঁর হাতের বহুমূল্য অঙ্গুরীয়টি পর্যন্ত খুলে দেন।

সিরাজের মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটে। সে ছুটে গিয়ে দাদুকে বার করে নিয়ে আসে। নবাব সিরাজকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকেন। এতক্ষণ যেন মজার খেলা হচ্ছিল, হেরে গিয়েছেন তিনি নাতির কাছে।

নবাব বলেন, 'তুমি আজ জিতে গেলে। তাই যে গঞ্জের নজরানায় হীরাঝিলের খরচ চলবে তার নাম থাকবে মনসুরগঞ্জ।'

সিরাজ হাসে—খুব হাসে। তার কৌশল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমার কিন্তু এ কৌশল ভালো বলে মনে হলো না। এতে উপস্থিত যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই অসন্তুষ্ট হয়েছে। এঁরা সবাই বাংলার

এক-একটি দিক্‌পাল। নবাব হবার আগেই তাঁদের এভাবে চটিয়ে দেওয়া সিরাজের পক্ষে উচিত হলো না।

সিরাজ তাঁদেরও বলে গোলকধাঁধায় প্রবেশ করতে। কিন্তু তাঁরা সম্মত হলেন না। তাঁরা নবাবকে নিয়ে হীরাঝিল ছেড়ে চলে গেলেন।

থামের আড়াল থেকে সিরাজের সামনে গিয়ে হাজির হই। সহসা আমাকে দেখে সে চমকে ওঠে, 'একি! কোথায় ছিলে তুমি?'

আঙুল দিয়ে থামটা দেখিয়ে দিই।

'ও, তুমি সব দেখেছো। কেমন মজা দেখলে তো?'

'দেখলাম। তোমার বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু কাজটা কি ঠিক হলো?'

'কেন? দাদু তো খুশি হয়েছেন।'

'দাদু খুশি হয়েছেন জানি, কিন্তু সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো দাদু নন। তোমার কৌশলকে দাদুর দৃষ্টিতে তাঁরা দেখেননি।'

'না দেখলে তো বয়ে গেল।'

'না নবাবজাদা, বয়ে যাবে না। ওঁরাই তোমার আশা-ভরসা। এখন থেকে ওঁদের হাতে রাখো।'

'তুমি মাঝে মাঝে কি যে বলো আমি বুঝতে পারি না, লুৎফা। ওরা বিরুদ্ধতা করলে ভয় পাবার কি আছে?'

'সে আমি জানি না, কিন্তু নবাব যখন তাঁদের অত সম্মান করেন, তখন নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে। নবাব মূর্খ নন। অপরিণামদর্শী তো ননই।'

আমার কথায় সিরাজ একটু গম্ভীর হলো। আমার পিঠের ওপর আলগোছে একটি হাত রেখে বলে, 'তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে ওসব ভাবনা পরে হবে। এখন এসো, একটু আনন্দ করা যাক্। আজকে হীরাঝিলের বরাত খুলেছে।'

সে আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে। ঝিলের পাশে ফুলগাছের শোভা। ঝিলের জলে ছোট্ট একখানা রঙিন বজরা ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। সে আমাকে নিয়ে সেই বজরায় ওঠে।

স্বপ্নের ঘোরে সময় কাটে। তীরে গিয়ে যখন উঠলাম, তখন রাত অনেক। হীরাঝিলের মহলে তখন হাজার বাতির শোভা। কত বিচিত্র রং সে-আলোর। হীরাঝিলের স্রষ্টার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

কিন্তু বেশিদিন নয়।

নিদারুণভাবে ভেঙে যেতে শুরু হলো হীরাঝিলের সুখস্বপ্ন। ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করায় বেগমসায়েবা সিরাজকে আমার কাছ থেকে একবার ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যর্থও হয়েছিলেন। কিন্তু হীরাঝিলের তুষারধবল মহল, তার শ্যামল বাগিচা আর স্বচ্ছ জল, এক কুহকিনীর মায়া বিস্তার করে সিরাজকে বিপথে চালিত করল। হীরাঝিল শুধু নির্জীব পাষাণ নয়, তার মধ্যে আমি শুনতে লাগলাম ডাইনির অট্টহাসি।

আমার সিরাজ দূরে সরে যেতে থাকে। দূরে, অনেক দূরে.....আমি নাগাল পাই না। এখানে আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। অথচ সিরাজ কতদিন আমার কাছে আসেনি। আমাকে সে ভুলে গিয়েছে।

পাষাণের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদি, মাথা কুটি, কিন্তু কোনো ফল হয় না। নবাব আলিবর্দির প্রভাব থেকে বাইরে চলে এসে সে এখন বেপরোয়া। সারা দিনরাত সে শুধু শরাব খায়, বন্ধুদের নিয়ে ফূর্তি করে, নর্তকী নিয়ে এসে নাচ দেখে। আবার সেই নর্তকীর সঙ্গে রাতও কাটায়। প্রতিদিনের প্রতীক্ষা শুধু

ব্যর্থ হয় আমার।

সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। বেগমগিরি আর ভালো লাগে না। আমি জারিয়া ছিলাম, আবার জারিয়া হবো। আমি ঘসেটি বেগমের পদাঘাত সহ্য করবো। আমি হামিদার অবহেলায় কিছু মনে করবো না। আল্লা, আমাকে আবার জারিয়া করে দাও। আমি আর পারি না। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আর আমার নেই, এখন শুধু নিরাশার অন্ধকার।

তবু একদিন সিরাজ এলো আমার কাছে। চোখ লাল, মুখে অনাচারের ছাপ, অঙ্গ শিথিল। আমি তার মুখের দিকে চাইতে না পেরে মাথা নীচু করি। সে বোধহয় আমাকে আজ তাড়িয়ে দেবে হীরাঝিল থেকে। আমি এখানে থাকায় তার অসুবিধা হচ্ছে। সে চায় নিশ্চিন্ত হতে। আমি বাধা সৃষ্টি না করলেও, ওর অবশিষ্ট বিবেকটুকুর জন্যে মনের মধ্যে সম্ভবত খচ্‌খচ্‌ করছে, আমার চোখের সামনে অনাচারের স্রোতে এভাবে গা ভাসিয়ে দিতে।

হীরাঝিল থেকে বিদায় নেবো। 'হীরাঝিল' নামটা আমিই দিয়েছিলাম না? সিরাজকে বলবো নাকি সেটা পালটে দিতে? তাহলে বিবেকের আর কোনো দংশনই থাকবে না তার। ও নাম মুখে যাক মুর্শিদাবাদের বুক থেকে—বাংলার ইতিহাস থেকে। সেই সঙ্গে বেগম লুৎফার নামও মুছে যাক।

'নবাবের ওখানে যেতে হবে, লুৎফা।' গম্ভীর স্বর সিরাজের। গলাটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত। শত হলেও সঙ্কোচ বলে একটা জিনিস আছে তো। এতদিন কত কথাই শুনিয়েছে—কত মধুর কথা।

নবাব মহলে যাবার জন্যে অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সিরাজের মুখ থেকে স্পষ্ট শোনার পর আমার চোখের জল কিছুতেই বাধা মানল না। শত চেষ্টাতেও বন্ধ করতে পারলাম না সেই অবাধ্য জলরাশি। সে আমাকে চায় না, তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদা বিড়ম্বনা। সিরাজ হয়তো ভাবছে, তার মন গলানোর জন্যে আমি চিরাচরিত পথ ধরেছি। কিন্তু আমি তো জানি তা নয়—কিছুতেই নয়। আমি চলে যেতেই চাই, বুক আমার ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এখন আমার কাছে হীরাঝিলও যা, নবাব মহলও তাই। আমি তো তার মতো নিত্য নতুন লোক নিয়ে বুক ভরাতে পারবো না। আমার বুকে যে শুধু একজনই রয়েছে, যার কাছে আজ আমার আর বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। আগে কেন আমি মরে যাইনি?

সিরাজ আবার বলে, 'নবাব মহলে যেতে হবে, লুৎফা।'

'আমি তা জানি।'

'জানো! কোথায় শুনলে?'

এত দুঃখেও হাসি পেলো। এ জানতে কি আর মুখের স্পষ্ট কথা শুনতে হয়? অনেক কিছুই বলতে পারতাম। কিন্তু বলে কি লাভ? চুপ করে থাকি।

'এখনই যেতে হবে, লুৎফা।'

'এখনই? এত তাড়াতাড়ি? সমস্ত জিনিস এখানেই থাকলো, নবাবজাদা। সামান্য দু' একটা পোশাক নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিছুই নিতে হবে না।' সে অধৈর্য হয়।

'চলুন তাহলে, আমি তৈরি।'

তার সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে আসি। আবার তাহলে জারিয়াই হতে চলেছি। মন্দ কি?

'তুমি কার কাছে শুনলে, লুৎফা? খবরটা তো আমিই প্রথম পাই।'

'আমি.....আমি কোনো খবর পাইনি, নবাবজাদা।'

'একটু আগেই যে বললে শুনেছো।'

'কোনো খবরের কথা তো আমি বলিনি?'

'দাদুর অবস্থা খারাপ, তুমি শোনোনি।'

আমি চককে উঠি, বলি, 'শুনিনি তো!'

'ও বুঝেছি।' কি বুঝলো সেই জানে। ক্লান্ত পা ফেলে সে এগিয়ে চলে।

নবাবের ঘরের আবহাওয়া থমথমে। বেগমসায়েবা একপাশে বসে রয়েছেন। তিনজন হাকিম নবাবের শিয়রে। আট-দশজন জারিয়া ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। হামিদাকে দেখলাম তাদের মধ্যে। সে দূর থেকে আমাকে দেখে একটু হেসে নত হলো। আমিও হাসলাম। ভাবলাম, এরা কত সুখী!

সিরাজ ঘরে ঢুকেই ছুটে গিয়ে নবাবের শয্যার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। নবাব তার পিঠে হাত রেখে অল্প একটু হাসেন।

সিরাজ বলে, 'এখন ভালো আছো, দাদু?'

'হ্যাঁ।' তিনি হাকিমদের দেখিয়ে বলেন, 'এঁরা বলছেন, আমি এত তাড়াতাড়ি মরবো না, আরও কিছুদিন ভুগবো। তোমার নবাবী পেতে একটু দেরি হবে।'

'এমন কথা বলো না, দাদু, আমি নবাবী চাই না, যাকে ইচ্ছে দাও। শুধু তুমি ভালো হয়ে ওঠো।'

নবাব আলিবর্দির চোখে জল দেখলাম। তিনি বললেন, 'ঠাট্টাও বুঝতে শেখোনি পাগল।'

'তোমার জীবন নিয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। অন্য কথা বলো।'

'বেশ, কি কথা বলবো?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

'কাল ফোর্থ সায়েব এসে পরীক্ষা করে যখন বললো যে, আমি আর বাঁচবো না, তখন সত্যিই ভয় হয়েছিল। মরতে যে এত ভয় হয় জানতাম না।'

'ফোর্থ সায়েব হঠাৎ এলো কেন?'

'কেন, সে তো রোজই আসে। অনেকক্ষণ বসে থাকে। খুব ভালো হাকিম যে।'

'সেইজন্যেই বললো বুঝি, তুমি মরে যাবে?' সিরাজের স্বরে বিদ্রূপ। সে নবাবের শিয়রে উপবিষ্ট হাকিমদের বলে, 'আপনাদের কি মত?'

একজন বলে, 'আমরা তো বলেছি আরো কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'তবে ফোর্থ সায়েব একথা বলে কেন? তার সঙ্গে কি নবাবের রোগ সম্বন্ধে আপনাদের কোনো আলোচনা হয়েছে?'

'না। সে কখন ও-কথা বলেছে তাও আমরা জানি না।'

'বুঝলে দাদু?' সিরাজ ঘুরে নবাবের দিকে চেয়ে বলে।

'কি?'

'ফোর্থ সায়েবের কোনো উদ্দেশ্য আছে।'

'নবাবীটা তুমি ঠিক চালাতে পারবে সিরাজ।'

'এতদিন সন্দেহ ছিল নাকি?'

'সন্দেহ এখানো সামান্য রয়েছে। তবে তোমার বুদ্ধি আর চতুরতার প্রমাণ এমন ছোটখাটো ঘটনায় প্রায়ই প্রকাশ পায়।'

'ফোর্থ সায়েবকে আর আসতে দিও না, দাদু। এখানে এসে হাকিমি করার অছিলায় নানান কথাবার্তা শোনার সুযোগ পায় সে। তুমি শয্যাশায়ী হলেও বাংলার নবাব। দেশের যাবতীয় আলোচনা এখানেই হয়।'

'সাবাস!' আলিবর্দি একটু জোর গলাতেই বলে ওঠেন।

'এখনই এতটা প্রশংসা করো না। আর একটা কথা বলে নিতে দাও। তাতে তুমি যে সম্মতি দেবে

না, তা আমি জানি। তবু বলা উচিত বলেই বলছি।

'বলো।'

'ইংরেজরা যে সোজা লোক নয়, সে-কথা তুমি বার বার বলেছো। তারা একদিন বাংলার বিপদ আনবে একথা তোমারই মুখে শোনা। আমারও বিশ্বাস তাই। ওদের বসতে দিলে ওরা শুতে চায়। তুমি বেঁচে থাকতেই তাই ওদের খতম করতে চাই। হুকুম দাও, আর পরামর্শ দাও।'

'তোমার মত খুবই সুচিন্তিত সিরাজ, কিন্তু আমি সম্মতি জানাতে পারছি না। পারছি না বলে আমার দুঃখ তোমার চেয়েও বেশি। কিন্তু কি করবো বলো। বর্গীদের মাথা ভেঙে দিলেও ওদের অত্যাচারের আগুন এখনো সম্পূর্ণ নিভে যায়নি। এর মধ্যে আবার সমুদ্রের জাহাজ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হলে আর এক অশান্তি। তার চেয়ে বলি কি দেশটা একটু সামলে উঠুক। কিছুদিন শান্তি ভোগ করুক সবাই। তাহলে শত্রুর ওপর নতুন শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারা যাবে। ততদিন আমি বাঁচবো না, কিন্তু তুমি তো থাকবে।'

সিরাজ চুপ করে বসে থাকে। সে যেন নবাবের কথায় প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু নবাবের যুক্তি একেবারে উড়িয়েও দিতে পারে না। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'বেশ, তাই হবে।'

'চললে কোথায়?'

সিরাজ থতমত খেয়ে আবার বসে পড়ে। বোকার মতো বলে, 'না, এই একটু বাইরে যাচ্ছিলাম।'

নবাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে তন্নতন্ন করে দেখেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বলেন, 'আমি জানি, তুমি কেন উঠেছিলে।'

'জানো!' সিরাজ অবাক হয়।

'হ্যাঁ!' শোনো দাদু, বুদ্ধি আর সাহস অনেক নবাবের থাকে। আমার আগের নবাব সরফরাজের সাহসের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর সময়ে দেশে কেন অশান্তি দেখা দিল? কেন প্রজারা তাঁকে চাইল না?'

'কেন?'

'বলছি।' নবাব সকলকে ঘরের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সেখানে শুধু বসে থাকলাম আমি, বেগমসায়েবা, আর সিরাজ।'

নবাব বললেন, 'সরফরাজ বিলাসিতায় বড্ড বেশি গা ভাসিয়েছিলেন। বেগমদের তুষ্ট করতেই তাঁর সময় চলে যেতো। দেশের দিকে তাকাবার অবসর থাকতো না।'

'আমাকে তুমি সেরকম ভাবো নাকি?' অভিমান করে সিরাজ।

'আমার ভাবায় কি আসে যায়? তবে এ সবের মূলে একটা জিনিসই রয়েছে, সেটা হলো শরাব। একবার যদি শরাব ধরা যায়, যদি তোমার ভেতরের আসল মানুষটিকে শরাব একবার কিনে নিতে পারে, তাহলে কোনো কিছুতেই আর ভেতরের সেই মানুষটিকে উদ্ধার করতে পারে না। তখন নানা দোষ এসে দেখা দেয়। সরফরাজের মধ্যেও সেই দোষগুলো প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আলিবর্দি হাঁপাতে থাকেন। তিনি দম নেন। ঘরে কোনো শব্দ নেই। সিরাজের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। সে কপালে হাত রেখে চুপ করে বসে থাকে।

নবাব আবার বলেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।'

'বলো।'

'হীরাঝিলে তুমি কি করো, সে খবর আমি পাই। তোমাকে আজ একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

'আমি প্রস্তুত দাদু।' সিরাজের কথায় দৃঢ়তা।

নবাব তাঁর মাথার কাছ থেকে কোরানখানা সিরাজের হাতে দিয়ে বলেন, 'এবারে বলো আর

কোনোদিন শরাব স্পর্শ করবে না।'

'পবিত্র কোরান ছুঁয়ে বলছি আর কোনোদিন শরাব স্পর্শ করবো না।' একটু হেসে সে আবার বলে, 'কিন্তু দাদু, কোরানের প্রয়োজন ছিল না। তোমাকে কথা দেওয়া কি কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞার চেয়ে কম?'

নবাবের চোখে আনন্দাশ্রু দেখা যায়। তিনি কোনো কথা বলতে পারেন না। শুধু দু'হাতে সিরাজকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে আনেন। ছোট্ট ছেলের মতো সিরাজও তাঁর বুকের ওপর মাথা রেখে স্থির হয়ে থাকে।

আমার মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে। গা বমিবমি করে। ঘামে আমার কপাল ভিজে যায়। বেগমসায়েবা বসেছিলেন। শক্ত করে তাঁর হাত চেপে ধরি।

'একি লুৎফা, অমন করছো কেন?' তাঁর স্বরে বিরক্তি।

'আমার শরীর কেমন করছে।'

'সে কি! আমাকে ছাড়ো দেখি, কাউকে ডেকে আনি। তোমাকে বেগম মহলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেবে।'

'হামিদাকে ডাকুন', কোনো রকমে বলি। আগে হামিদা আমাকে হিংসে করলেও সে ভালো। তার ভেতরে স্নেহ আছে।

হামিদার সঙ্গে বেগম মহলে গিয়ে বমি করে ফেলি, 'আমি আর বাঁচবো না, হামিদা।'

'অমন কথা মুখে আনতে নেই। অসুখ হয়েছে সেরে যাবে।'

'না-না, আমার যেন কেমন লাগছে।' বুঝলাম, সিরাজের অবহেলায় অভিমানে অনেকদিন অর্ধাহারে থাকার ফল। শরীর ভেঙে পড়েছে।

'আপনি স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন, আমি একজন হাকিম ডেকে আনি। তাঁরা তো রয়েছেনই।'

হামিদা ঘর ছেড়ে চলে যায়। একদিন মৃত্যু কামনা করতাম, অথচ আজ সামান্য অসুখে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে উঠলাম কেন? এতদিন কি তবে নিজেকে চিনতে পারিনি? কিংবা মৃত্যু হবে না জেনেই নিশ্চিন্ত মনে কামনা করতাম?

আজ হয়তো সিরাজের প্রতিজ্ঞা শুনে নতুন করে বাঁচবার সাধ হয়েছে আমার। সিরাজ আর শরাব খাবে না। শরাব না খেলে তার বন্ধুরাও আর এসে জুটবে না। বন্ধুরা না এলে সে আমার কাছে আসবে, আমার সাথে কথা বলবে, আমাকে আদর করবে। আমি মরতে চাই না। না, না....

হাকিম আসেন। বেগমসায়েবাও আসেন সেই সঙ্গে। উঠতে চেষ্টা করি আমি। বেগমসায়েবার সামনে শুয়ে থাকতে সঙ্কোচ বোধ হলো।

'উঠো না। তুমি এখন অসুস্থ।' বেগমসায়েবা বলেন।

হাকিম অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসেন।

'হাসলেন কেন, হাকিম সায়েব?' বেগমসায়েবার প্রশ্ন।

'ব্যাপারটা একটু হাসির বৈকি।! বেগমসায়েবার সামনে হাকিমের উক্তি একটু বিসদৃশ। রোগ নির্ণয় করতে পারেনি বলে সে হয়তো উড়িয়ে দিতে চায়। নবাবের ব্যাপারেও এমন করছে না তো? আসলে ফোর্থ সায়েবের কথাই হয়তো ঠিক।

'হাসির ব্যাপার!' বেগমসায়েবা চমকে ওঠেন। তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। আমার অসুখটা নিশ্চয় ভাঁওতা বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। আমার কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে ভেবে তিনি হয়তো চিন্তিত হয়েছেন।

'কি হয়েছে খুলে বলুন?' আমি চেঁচিয়ে উঠি।

'আপনি কিছু খেতে পারছেন না, তাই না?' হাকিমের উক্তিতে ভয়ে কেঁপে উঠি। ঠিকই ধরেছে সে। কিন্তু আমার মতো যার মনের অবস্থা, খাওয়ার প্রতি তার কি কোনো রুচি থাকে?

মরিয়া হয়ে বলি, 'হ্যাঁ।'

'খুব স্বাভাবিক। এ সময়ে অমন হয়।'

'কোন্ সময়?' এবারে বেগমসায়েবা অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

'মা হবার আগে।'

ভয়ে আর আনন্দে আমি কেঁদে ফেলি। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর রং যেন পাল্টে যায়। সিরাজের সন্তান আমার গর্ভে! কবে এসেছিল আমার গর্ভে? ঝিলের মধ্যে সেই বজরাতে কি? বুঝে উঠতে পারি না। ঠিক সিরাজের মতো মুখ, তার মতো চোখ, হাত-পা। তিলে তিলে বড় হচ্ছে সে। আমার দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে সিরাজের সন্তান বড় হচ্ছে—যে সিরাজ আমাকে চায় না।

চোখের জলে বিছানা ভিজে যায়।

বেগমসায়েবা বলেন, 'কাঁদছো কেন? এ তো আনন্দের কথা।'

'আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে।'

'ভয়ের কিছু নেই। চুপ করে শুয়ে থাকো।' হামিদা ছাড়া সবাই চলে যায়। হামিদা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

'হামিদা, এ কি ভালো হলো?'

'সেকি! এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? বাংলার আর এক নবাব আপনার গর্ভে। আজ আপনার চেয়ে সুখী কেউ আছে?'

'না হামিদা, আমার বড় ভয় হচ্ছে।'

'অমন হয়। শরীর খারাপ তো? একটু সুস্থ হলে দেখবেন মনটা কেমন আনন্দে ভরে উঠবে।' হামিদার চোখে-মুখে একটা মাতৃত্বের ভাব ফুটে ওঠে। বড় ভালো লাগে আমার।

'তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবো, হামিদা।'

'বেশ তো, ভালোই হবে।'

সিরাজ শরাব ছেড়ে দিয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। অবশ্য নিশ্চিন্ত হবার জন্যে কোনো খোঁজ নিইনি। লুকিয়ে কিছু করতে আমার মন চায় না, বিশেষ করে সিরাজের ব্যাপারে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক লুকোচুরির নয়।

ওর মন বড় দুর্বল। শরাব ছাড়ার পরে পানপাত্রগুলোকে দেখে হয়তো দুর্বলতা উঁকি দিয়েছিল, তাই অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের নিজের হাতেই সে সেগুলোকে একটার পর একটা ভেঙে চুরমার করেছে। শুনলাম, শরাবপায়ী বন্ধুদেরকেও হীরাঝিলে আসতে মানা করে দিয়েছে। শরাববাহীদের কাজ গিয়েছে।

তবু সে আর আগের সিরাজ নেই। আমার কাছে আসে না। ভুলে কখনো এলেও তেমন করে আর কথা বলে না। আমি আর তার 'প্রাণের আধখানা' নই, তার প্রাণ এখন আমি ছাড়াই পরিপূর্ণ। আমি সেখান থেকে নির্বাসিত।

একদিন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

'কি লুৎফা?'

কথা খুঁজে পাই না। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যাই। তাড়াতাড়ি বলি, 'কিছু না, নবাবজাদা।'

'তোমার শরীর ভালো তো?'

'হ্যাঁ, নবাবজাদা।'

ব্যস্, কথা ফুরিয়ে যায় আমার আর সিরাজ, দু'জনারই। তবু দাঁড়িয়ে থাকি।

'কিছু বলবে?'

বলবো বলেই তো এসেছি, কিন্তু বলতে গিয়ে যে ঠোঁট ফুলে ওঠে, চোখ জ্বালা করে। শেষে বলে ফেলি, 'জেবউন্নেসা বেগমকে হীরাঝিলে নিয়ে আসুন।' সিরাজকে, 'তুমি' বলতে বাধো-বাধো লাগে আজকাল।

'কেন?' কথাটা সে একটু বেশি জোর দিয়ে বলে।

'আমার তো এই অবস্থা।'

'আমার জন্যে আমার চেয়েও তোমার ভাবনা বেশি দেখছি।' তার কথায় এতটুকু মিষ্টতা নেই, এতটুকু দয়া নেই। তার জন্যে আমার ভাবনা না হলে কার হবে? কারও সে-ভাবনা হতো না বলেই তো একদিন আমাকে জারিয়ার আসন থেকে তুলে বুকে টেনে নিয়ে বেগমের আসনে বসিয়েছিল। আজ সে-কথা কে বলকে ওকে?

সিরাজ আবার বলে, 'কি বলতে চাও তুমি?'

'কিছু না নবাবজাদা, কিছু না। দয়া করে আমাকে রেখেছেন, দু'টো খেতে পাচ্ছি। তাই ভেবেছিলাম, আপনার অসুবিধের দিকে আমার তাকানো উচিত।'

'এটা কি অভিমান?'

'না-না, অভিমান নয়। আমি সত্যি ভেবেই বলছি।' ছুটে পালাতে যাই।

সিরাজ আমার হাত ধরে ফেলে বলে, 'শোনো লুৎফা। শরাব ছেড়েছি, কোনোদিন ছোঁবো না আর। কিন্তু শুধু ছাড়লেই তো হলো না। এতদিনের অভ্যাস ছাড়তে কষ্ট হয়। তাই শরাবের বদলে আর কিছুর প্রয়োজন। তুমি ঠিকই ধরেছো, কিন্তু জেবউন্নেসা নয়। সে শরাবের নেশা ছাড়াতে পারবে না। সে সুন্দরী, কিন্তু তার স্বভাব আর কথাবার্তা আমাকে মাতিয়ে তুলবে না, বরং বিরক্তির সৃষ্টি করবে। আর তোমার কথা তুমি নিজেই জানো। তাই একটা কাউকে চাই তো।'

'এত বেগম রয়েছে আপনার, আর কাউকে নিয়ে আসুন।'

'কেউ না, কেউ পারবে না। তারা সব পুতুল। সেজে-গুজে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে তাদের মধ্যে প্রাণ নেই।'

'তবে.....'

'তবে কি করবো সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমিই ব্যবস্থা করেছি।'

তার কথায় আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আবার কোন্ আগুনের খেলায় মাততে চাইছে সে কে জানে? তার মতলব জানবার জন্যে মন ছটফট্ করে। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। আগের লুৎফা আর আমি নেই। আমার শারীরিক গঠন আর সৌন্দর্য কিছুদিনের জন্যে বিলুপ্ত হতে বসেছে। এখন আমি ভ্রূণবাহী-জীবমাত্র। আমার কটাক্ষে আগে যদিও বা কিছু চঞ্চলতা ছিল, এখন তা অদৃশ্য হয়েছে। এখন সে কটাক্ষ ভারী, গভীর, আর মমতাময়।

'তোমার বোধহয় মন খারাপ হলো।' সিরাজের মুখে হাসি।

ঠাট্টা করছে নাকি?

'না নবাবজাদা, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। আপনার সুখের জন্য যদি আমি কোনোরকম সাহায্য করতে পারি তাহলে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করবো।'

'তুমি কিছুটা সাহায্য করতে পারো।'

'আদেশ করুন।'

'আমার বন্ধু মোহনলালকে নিশ্চয়ই চেনো?'

'এখানে তাকে আসতে দেখেছি।'

'তার এক বোন রয়েছে দিল্লিতে। অপূর্ব সুন্দরী—স্বর্গের অপ্সরী বললেও চলে। সেখানে সে

নর্তকী। সে সুগায়িকা। আমি তাকে বেগম করে হীরাঝিলে রাখবো। সে নাচ-গান আর ভালোবাসায় আমাকে মাতিয়ে তুলবে। শরাবের নেশার কথা আমার আর মনে থাকবে না। প্রতিদিন নতুন উৎসাহ নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো! তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করো।'

আমার মাথা ঘুরছিল। নর্তকী হবে বাংলার বেগম! সিরাজের কি মাথা খারাপ হলো? পড়েই যেতাম, কিন্তু আত্মহত্যা করার এক অবিচল প্রতিজ্ঞা আমাকে পড়তে দিল না। সিরাজের কথার জবাবে দৃঢ়ভাবে বললাম, 'কি সাহায্য আমার কাছে আপনি চান, নবাবজাদা?'

'সাহায্য এমন কিছু নয়। শুধু তুমি কেঁদে ভাসিও না। আর দাদিরা যেন কিছু শুনতে না পায়। তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি। কারণ, তোমারই সব চাইতে বেশি হিংসে হবে।'

হীরাঝিলের মহলের কোনো নির্জন জায়গায় গলায় দড়ি দিতে সুবিধে হবে, অথবা ছাদের কোনো জায়গা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লে সহসা কারও চোখে পড়বে না, এই কথা ভাবতে ভাবতে আমার ভীষণ হাসি পেয়ে যায়। শত চেষ্টাতেও না চাপতে পেরে হেসে উঠলাম।

হাসিটা নিশ্চয়ই জোরে হয়েছিল। কারণ, সিরাজ দু'পা পিছিয়ে গেল।

আমি বলি, 'আমার হিংসে হচ্ছে না, নবাবজাদা, আনন্দ হচ্ছে। আপনি সুখী হবেন, একি কম কথা? আপনার সুখ নবাব আলিবর্দি থেকে শুরু করে বাংলার সবাই চায়। আমি কেন হিংসে করবো? অমন সুন্দরী নর্তকী আসছেন বেগম হয়ে, তাঁকে দেখবার সুযোগ মেলা কতখানি ভাগ্যের কথা। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, নবাবজাদা। একটা কুকুর পুষলেও তার ধরন-ধারণ চেনা যায়। আমাকে এতদিন দেখেও চিনলেন না?'

'না-না, তা নয়। আচ্ছা, চলি।'

শরাব না খেলেও, শরাব খাওয়ার মতো টলতে টলতে সে চলে যায়। মোহনলালের বোনের রূপের কথা শুনেই তার নেশা ধরেছে—চোখে দেখলে হয়তো ঢলে পড়বে।

ঘটা করে একদিন নিয়ে আসা হলো মোহনলালের বোনকে। হীরাঝিলের মাথায় উঠে লুকিয়ে দেখলাম সব। দূর থেকে মনে হচ্ছিল আট-দশ বছরের এক বালিকা। তেমনি রোগা আর ছোট। তবে গায়ের রং যেন ফেটে পড়ছিল। সকালের রোদ্দুর পড়ে অপূর্ব দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। নেশা ধরাবার মতোই রূপ বটে। সিরাজের কল্পনা নিশ্চয় আহত হয়নি মেয়েটিকে দেখে। ঝিলের ধারে তার হাসি-হাসি মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সে-কথা।

কাল সন্ধ্যার সময় মেয়েটির আগমনবার্তা যখন আগে পৌঁছে দিয়ে গেল একজন ঘোড়সওয়ার, তখন থেকেই সিরাজ ছট্‌ফট্ করছিল। তার মনে হয়েতো হয়েছিল, ঘোড়ার পিঠেই কেন এলো না সুন্দরী, তাহলে তো একদিন আগে এসে পৌঁছতে পারতো।

ভোরবেলা থেকে উঠে সিরাজ বাগিচার মধ্যে বসে রয়েছে। রাতে ভালোভাবে ঘুমোতেও পারেনি। আহা, বেচারা! এখন থেকে শুধু দিনেই ঘুমোতে হবে তাকে, রাতে আর সময় পাবে না।

ঝিলের ধারে মেয়েটি সিরাজকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই, সে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, ঠিক প্রথম দিন আমাকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। সিরাজের সুগঠিত দুই বাহুর মধ্যে মোহনলালের বোন অদৃশ্য হয়। এত ছোট কেন সে? ছোট বলেই বোধহয় এত সুন্দর!

এখনই আত্মহত্যা করবো কি? ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বো? না থাক্ দু'দিন যাক্। নয়নভরে একটু দেখে নি, সিরাজ কিরকম মেতে ওঠে। আমাকে নিয়েও সে মেতেছিল কিছুদিন। কিন্তু আমি তো তার নেশা ধরাতে পারলাম না।

আমি নাচতে জানি না, গাইতে জানি না। ভালোভাবে কথা বলতেও জানি না আমি। আমি যা

জানি, সেটা অপরাধ। আমি শুধু ভালোবাসতে জানি। ভালোবাসলে যে ভালোবাসার পাত্রকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দেওয়া যায় না। আমার কাছে সিরাজ প্রতি পদে বাধা পেতো। যদিও জোর করে বাধা দিইনি কখনো, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে, কথায়-বার্তায় তাকে সংযত রাখতাম।

সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই মনে মনে মুক্তি চেয়েছিল। মুক্তির আশাতেই তার হীরাঝিল তৈরির পরিকল্পনা। তখন অতোটা বুঝিনি। বোকার মতো তাই আমিই নামকরণ করে দিয়েছিলাম। সিরাজ মনে মনে কত হেসেছিল।

ছাদ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসি। আজকাল ওঠা-নামা করতে কষ্ট হয়। শরীরটা বড় ভারী। নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ি। একজন বাঁদী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সামনে দাঁড়ায়। তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করি। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। এইভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে যদি মৃত্যু আসে কত আরামের হয়। ঘুমোতে গিয়ে সে ঘুম আর ভাঙে না, এমন তো কত হয়? আমার বেলাতেও কি তা হতে পারে না? হলে হীরাঝিলকে আর দেখতে হতো না। গঙ্গার জলের স্রোত আর দেখতাম না। দূরে ঐ পারে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় ধুলো আর কখনো দেখতে হতো না। বিষ, সব বিষ; জলে স্থলে বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এই বিষ। আমার গর্ভেও বিষ।

ভারী পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি, সিরাজ আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। বিস্মিত হই। এমন দিনে সে আমার ঘরে। মোহনলালের বোনকে ছেড়ে আকারবিহীন এক স্ত্রীলোকের ঘরে বাংলার নবাবের আদুরে নাতি!

উঠে বসতে কষ্ট হয়। তবু যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে বসি। মুখে হাসি আনি। হাসতে হবে যে—আমার যে আনন্দ হচ্ছে সিরাজের মুখ দেখে। সে-মুখ পার্থিব, চরম পাওয়ার আনন্দে ভরপুর।

সে বলে, 'সে এসেছে লুৎফা। বেহেস্তের পরী। দেখবে?'

'নিশ্চয়ই দেখবো, নবাবাজাদা। কিন্তু এখন তো পারবো না। পরে দেখলে অপরাধ নেবেন কি?

'তাকেই এখানে নিয়ে আসি। কি বলো?'

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে হতে পারে সিরাজ বাংলার ভবিষ্যৎ নবাবা, কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সম্মানবোধ রয়েছে, সে সম্মানও কি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না এরা? ক্ষমতা কি মানুষকে এত উন্মত্ত করে?

ধীরে ধীরে বলি, 'তাকে কেন আনবেন, নবাবজাদা? আর কেনই বা সে আসবে? তার সম্মান নেই? এতে সে হয়তো অপমানিত বোধ করবে।'

'কিছু মনে করবে না, আমি নিয়ে আসি।' সিরাজ চলে যেতে চায় আর কি।

'না না না, আনবেন না। আমিই যাচ্ছি।'

'তুমি তো উঠতেই পারছো না। কি করে যাবে?'

'আমি বেশ উঠতে পারছি, আপনি চলুন।'

সিরাজের পেছনে গিয়ে হাজির হই বড় ঘরটার মধ্যে। গা এলিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসেছিল বেহেস্তের পরী। পরীই বটে! এত কাছ থেকে দেখেও আমার চোখের পলক পড়ে না।

আমাকে দেখে হেসে ওঠে সে—খিল্‌খিল্ করে হাসে। সে-হাসি আর থামতে চায় না।

সিরাজ বলে, 'অত হাসছো কেন ফৈজী?'

ফৈজী আমাকে দেখিয়ে আবার হেসে গড়াগড়ি যায়। আমি অসহায়ভাবে সিরাজের দিকে চেয়ে থাকি.।

'ওকে দেখে অত হাসির কি হলো তোমার?' সিরাজ প্রশ্ন করে।

'কে এ?' এতক্ষণে ফৈজী কথা বলে।

'লুৎফা।' সিরাজ আমতা আমতা করে।

'লুৎফা? বাঃ, নামখানা তো সুন্দর! এ দশা কে করলো? আপনিই বুঝি?' সে আবার হেসে ওঠে।

আমার কান গরম হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ছুটে বার হয়ে যাই, কিন্তু পারি না। শরীর আরও ভারী হয়ে যায়। বুঝলাম, বেশিক্ষণ আর দাঁড়াতে পারবো না।

সিরাজকে বলি, 'আমাকে যেতে আদেশ করুন, নবাবজাদা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি যাও।'

ফৈজী বলে, 'সে কি! এত তাড়াতাড়ি? আলাপই যে হলো না। আর আপনি তো আমার কথার জবাব দিলেন না।'

'আমারই সন্তান রয়েছে লুৎফার গর্ভে।' সিরাজ স্পষ্ট বলে।

'ভালো। তা, এখন আর কেন রেখেছেন? কাজ তো মিটেছে, এবার বিদায় করুন। নাকি, ওই সন্তান বাংলার নবাব হবে?'

আমি চীৎকার করে উঠি, 'নবাবজাদা, আমাকে একটু ধরবেন?'

সিরাজ ছুটে এসে আমাকে ধরে বলে, 'কি হয়েছে?'

'আমি বোধহয় পড়ে যাবো। দয়া করে এই ঘরের বাইরে দিয়ে আসবেন?'

সিরাজ আমাকে বাইয়ে নিয়ে আসে। ফৈজীর কথা শুনে সে যে আমাকে থাকতে বলেনি, এজন্যে মৃত্যুর আগের কয়দিন তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

'এখানেই বসি, নবাবজাদা, আপনি যান।'

'সে কি! এখানে বসার জায়গা কই?'

'মেঝেতেই বসবো। আপনি যান নবাবজাদা। উনি অপেক্ষা করছেন।'

'তা কি করে হয়? কেউ এসে আগে তোমাকে নিয়ে যাক্।'

'না-না, এতেই হবে। আপনি কিছু ভাববেন না।'

সিরাজ আমাকে বসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আপনি যান, নবাবজাদা।'

সে চলে যায়।

ফৈজীর ওজন নাকি মাত্র বাইশ শের!

একজন বাঁদী এসে খবর দিল, ফৈজীর ওজন করা হয়েছে। সিরাজ খুব হাসাহাসি করেছে শুনলাম। হাসাহাসি সে সব সময়ই করছে। হীরাঝিলের গাছে, ছাদে, ঘরে তাদের হাসির তরঙ্গ সামান্য সময়ের জন্যেও থামছে না। ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকলে এসব শুনতে পেতাম না। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ওদের দাপাদাপি আর লুকোচুরি খেলার জন্য আমি নির্জনতা খুঁজে পাই না। নির্জনতা আমার খুবই প্রয়োজন। অন্তত ছাদটুকু নিরিবিলি হওয়া দরকার। অথচ নিশ্চিন্ত মনে সেখানে যাবারও উপায় নেই। কখন ওরা দু'জনে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ে তার স্থিরতা নেই। বাঁদীদের সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ওদের তো তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং ওরাই এখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে।

এরই মধ্যে একসময় ছুটে গিয়ে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া যায়। সে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু পারিনি। ভয় করে। মনকে শক্ত করার জন্যে সময়ের প্রয়োজন। সেই জন্যেই চাই নির্জনতা।

কাল একবার ছুটে গিয়েছিলাম ছাদে। ভেবেছিলাম, কোনোরকম চিন্তা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গর্ভের শত্রুটা নড়েচড়ে উঠল। এক অনাস্বাদিত মায়ায় আচ্ছন্ন হলো আমার মন। মরা হলো না।

শরাব ছাড়ার পর সিরাজ তার বন্ধু-বান্ধবদের বিদায় দিলেও মোহনলাল নিয়মিতই আসতেন। ফৈজী আসার পর থেকে তাঁকেও আসতে দেখি না আর। ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ বলে মনে হালা। তাঁর বোন সিরাজের বেগম। এখন তাঁর আরও বেশী আসা উচিত। কিন্তু এভাবে হীরাঝিলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কেন যে তিনি উঠিয়ে দিয়েছেন বুঝলাম না। এখন তো বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হওয়াই উচিত।

কৌতূহল মেটাবার কোনো পথ নেই। সিরাজকে প্রশ্ন করলে সব জানা যায়, কিন্তু তাকে প্রশ্ন করার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। তার দেখা পাওয়াও ভার।

মোহনলালকে বীর যোদ্ধা বলে জানি। বেগমসায়েবার মুখে তাঁর নাম প্রথম শুনি। বেগমসায়েবা সাধারণত কারও সুখ্যাতি করেন না। রাজা জানকীরামের মতো লোক সম্বন্ধে নবাব সুখ্যাতি করলেও, তাঁর মন্তব্য কোনোদিন শুনিনি। সেই বেগমসায়েবা যখন মোহনলালের সুখ্যাতি করলেন, তখন থেকেই তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধাভাব গড়ে উঠেছিল আমার মনে।

হীরাঝিলে সিরাজের বন্ধুবান্ধব অনেকেই আসতো। তারা পাল্লা দিয়ে শরাব খেতো, স্ফূর্তি করতো। ঝিল থেকে বিদায় নেবার সময় তাদের পা টলতো। কিন্তু মোহনলালকে কোনোদিন শরাব স্পর্শ করতে দেখেনি কেউ। তিনি যখন এখান থেকে চলে যেতেন, তখন স্বাভাবিক মানুষের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে যেতেন। এ সমস্ত দেখেশুনে তাঁর সম্বন্ধে আরও উঁচু ধারণা হয়েছিল আমার মনে।

কিন্তু যখন শুনলাম, নিজের বোনকে নবাবের বেগম করবার জন্যে তিনি দিল্লি থেকে নিয়ে আসছেন, তখন আমার এতদিনের শ্রদ্ধায় ফাটল ধরল। শুধু ফাটল নয়, একটা ঘৃণাভাব জন্মাল তাঁর প্রতি। বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে সামান্য একজন নর্তকীকে তিনি হারেমে পাঠালেন। হোক্ না কেন সে সুন্দরী, তবু একদিন কত লোকের মন জুগিয়েছে, দেহ বিক্রি করেছে।

মোহনলাল এখন আমার শত্রু। তবু জানতে হবে, তিনি কেন হীরাঝিলে আসেন না। ব্যাপারটা অদ্ভুত।

একেই বলে বোধহয় নারী-মন। আত্মহত্যার জন্যে পাগল হয়েও সামান্য একটা কৌতূহল মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠল ধীরে ধীরে। যতক্ষণ এ কৌতূহলের নিরসন না হয়, ততক্ষণ যেন শান্তি নেই।

অথচ কোনো প্রয়োজনও নেই। মরে গেলে তো সব কিছুর বাইরে চলে যাবো। সেই ভেবে নিজেকে কত বোঝালাম, কিন্তু সব বৃথা।

কৌতূহলের নিবৃত্তি হলো শেষে। সিরাজের মুখেই শুনলাম। তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে অবশ্য একটু কৌশল অবলম্বন করতে হলো। স্নানের সময় তার গোছলখানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানেই দেখা হলো।

'তুমি এখানে লুৎফা?'

'আমার যেন মনে হলো আপনি কাউকে ডাকছেন। কেউ এলো না দেখে আমি নিজেই এলাম। কোনো দরকার আছে কি, নবাবজাদা?'

'না, আমি তো কাউকে ডাকিনি।'

'ও, তবে আমারই ভুল।' নিরাশ হয়ে চলে আসতে চাইলাম।

'শোনো।' পেছন থেকে সিরাজ ডাকে।

ফিরে এসে তার সামনে দাঁড়াই।

'তুমি কি বলতে এসেছিলে, বলো?'

'আমি? কিছু না তো। ওই যে বললাম....'

'ও কথা থাক। কেন এসেছিলে?'

চুপ করে থাকি। ধরা পড়ে গিয়েছি। এতদিনের পরিচয়ের পরও সিরাজকে আমার জানা উচিত ছিল। তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের দিনই তো ধরা পড়ি। তবে কেন বোকার মতো একই কৌশল অবলম্বন করলাম?

'ভয় নেই, লুৎফা। বলো, কি জানতে চাও?'

'নবাবজাদা, অপরাধ নেবেন না তো?'

'না।'

'ফৈজী বেগম আসার পর থেকে মোহনলালকে হীরাঝিলে দেখি না। তিনি তো আপনার একজন হিতৈষী?'

আমার কথায় সিরাজ বিচলিত হয়। সে দু'বার পায়চারি করে। একবার হীরাঝিলের সীমান্তে গঙ্গায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। তারপর আমার খুব কাছে এসে আমার মুখের দিকে তাকায়।

তার হাবভাবে সঙ্কুচিত হই। বলি, 'না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি, নবাবজাদা। মাফ করুন।'

'অন্যায় করোনি। আমি ভাবছি, এমন একটা কিছু তুমি লক্ষ্য করেছ যা ধারালো বুদ্ধি ছাড়া নজরে পড়ার কথা নয়। তুমি বুদ্ধিমতী জানি, কিন্তু সে-বুদ্ধি এতটা তীক্ষ্ণ জানতাম না। মোহনলালের জন্যে আমারও বড় অশান্তি।'

'কেন নবাবজাদা?'

'ফৈজী এখানে আছে বলে সে আর আসে না।'

বিস্মিত হয়ে বলি, 'কিন্তু তিনিই তো তার বোনকে আনিয়েছেন!'

'হ্যাঁ, সে আনিয়েছে, তবে চাপে পড়ে। তার আনার আদৌ ইচ্ছে ছিল না।'

'সেকি নবাবজাদা! নিজের বোন বেগম হলো, এ তো তাঁর সৌভাগ্য। তবে কি তিনি ফৈজীর ধর্মান্তরের জন্যে বিরক্ত?'

'ফৈজী বহুদিন আগেই মুসলমান হয়েছে।'

'তবে?'

'মোহনলাল বলেছিল, ফৈজী তার বোন হলেও সে নর্তকী। নর্তকীকে আমি বেগম হিসেবে নিই, ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু তুমি তো জানো লুৎফা, লোকের মুখে তার রূপের খ্যাতি শুনে আমি পাগল হয়েছিলাম। তাই মোহনলালের আপত্তি সত্ত্বেও তাকে নিয়ে আসি। এখন তো দেখছো আমি ঠকিনি। ভারতের কোনো হারেমে ফৈজীর মতো সুন্দরী নেই।'

আমি অভিভূত হই। মোহনলালের প্রতি কিছুদিনের জন্যেও বিরক্ত হয়েছিলাম ভেবে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। এত বড় হিতৈষীকে সিরাজ চিনল না।

তবু মরার আগে একটা সান্ত্বনা পেয়ে গেলাম। বুঝলাম, সিরাজের কাছ থেকে শত আঘাত পেলেও তার বিপদের দিনে মোহনলাল দূরে সরে থাকতে পারবে না। বুক দিয়ে রক্ষা করবে সে সিরাজকে। তাকে ভালোবাসে বলেই মোহনলাল আজ এত দূরে।

সিরাজ হেসে বলে, 'বুঝলে লুৎফা, মোহনলালের রাগ রয়েছে। সে এখানে আর আসে না। না আসুক, ফৈজী থাকলে পৃথিবীতে আর কাউকে আমি চাই না।'

তাই বটে। বাংলার ভাবী উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত কথাই বটে। দুঃখ হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারি

না। প্রতিবাদ করার মতো মনের জোরও নেই, সে অধিকারও নেই।

'নবাবজাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?'

'কি কথা?'

মোহনলাল যে রাগ করে হীরাঝিলে আসেন না, একথা কি ফৈজীকে বলেছেন?'

'না, সময় পাইনি। তার সঙ্গে এসব কথা বলার অবসর কই?'

'না বলে থাকলে আর বলবেন না।'

'কেন বলো তো?'

'এমন কিছু নয়। তবে একটা কথা বলে যাই নবাবাজাদা, মোহনলাল আপনার সুখের দিনে দূরে সরে গিয়েছেন বলেই বিপদের দিনে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসবেন।' কথাটা বলেই তাড়াতাড়ি চলে যাই। ছুটতে আর পারি না। তবু যতটা সম্ভব ছুটি—সিরাজের দৃষ্টির বাইরে।

নবাব আলিবর্দির মৃত্যু হলো। আকস্মিক মৃত্যু নয়, তবু শোকের ছায়া নামল সারা মুর্শিদাবাদ জুড়ে। নিদারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও নবাব মহল থেকে খোসবাগ পর্যন্ত অগণিত জনতা রাস্তার দু'পাশে ভিড় করলো। দু'পাশের বাড়ি থেকে নবাবের শবাধারের ওপর পুষ্পবৃষ্টি হলো। ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেল রাস্তার রাঙা মাটি।

ছায়াশীতল খোসবাগে যখন নবাবের মৃতদেহ এসে পৌঁছল তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ঘন বৃক্ষরাজির অসংখ্য শাখা-প্রশাখার আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে।

বেগম মহলের সবাই এসে জড়ো হলো একটা আড়াল দেওয়া জায়গায়। সেখান থেকে বৃদ্ধ নবাবের মৃতদেহকে সমাধিস্থ হতে দেখা যাবে।

বেগমসায়েবাকে এই প্রথম কাঁদতে দেখলাম। নবাবের মৃত্যুর সময় তিনি কাঁদলেন না। তাঁকে নিয়ে এতটা পথ আসার সময়ও তঁর চোখে জল দেখিনি। কিন্তু নবাবের দেহ যখন মাটির নীচে অন্তর্হিত হলো, তখন তিনি আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। জীবনে তাঁর বোধহয় এই প্রথম আর শেষ ক্রন্দন। আজীবন স্বামীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনপথে এতদূর এগিয়ে এসে আজ তিনি সঙ্গীহারা হয়ে পড়লেন। পাটনার এক সামান্য কর্মচারীর জীবনের সঙ্গে যে জীবন একদিন জড়িত হয়েছিল, সুখে-সৌভাগ্যে নানান উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে সে-জীবন আজ বিচ্ছিন্ন হলো। নবাবকে দুঃসময়ে পরামর্শ দিয়ে, শোকে সান্ত্বনা দিয়ে, সুসময়ে পবিত্র প্রেমের মধ্যে দিয়ে, শেষদিন পর্যন্ত ঢেকে রেখেছিলেন বেগমসায়েবা। আজ আর কাকে ঢেকে রাখবেন তিনি? তাঁর কাজ ফুরিয়েছে। সব শূন্য হয়ে গেল, মনের ভেতরও খাঁ-খাঁ করছে, তাই তিনি কাঁদছেন।

তাঁর দিকে চেয়ে আমিও কেঁদে ফেলি।

হঠাৎ সিরাজের উচ্চ কণ্ঠস্বরে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। এ সময়ে সে এত উত্তেজিত কেন?

সমাধি ঢেকে দেবার জন্যে একটা স্বর্ণখচিত কৃষ্ণবস্ত্র আনা হয়েছিল। সেই বস্ত্র সমাধির কাছে বয়ে নিয়ে যাবার সময় সিরাজ ছুটে এসে বাধা দেয়।

সিরাজ বলে, 'এই কালো কাপড় কখনই দেওয়া হবে না দাদুর কবরে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দির সমাধির ওপর কৃষ্ণবস্ত্র? কে এনেছে এটা? কে?'

সবাই চুপ করে থাকে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের প্রশ্নের জবাব দেবার সাহস কারও নেই। হামিদার কাছে শুনলাম, জগৎশেঠ এনেছে ওটা। জগৎশেঠের মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই বুঝলাম, সে প্রমাদ গণছে।

বেগমসায়েবা সোজা এগিয়ে যান সিরাজের সামনে। বলেন, 'এখন আর গোলমাল করিস নে,

সিরাজ। ওঁকে ঘুমোতে দে। ঘুম ভেঙে যাবে তোর চীৎকারে।'

তাঁকে জড়িয়ে ধরে সিরাজ শিশুর মতো কেঁদে বলে, 'না দাদি, তুমি অমন করো না। ও কাপড় আমি কিছুতেই দিতে দেবো না। দাদুর কবরের ওপর থাকবে লাল কাপড়—টক্‌টকে লাল।'

'ও কাপড় এখন কোথায় পাবি?'

'পাওয়া যাবে না? নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কেউ আছে এখানে, এনে দিতে পারো লাল কাপড়? টক্‌টকে লাল।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সমস্ত ভিড় স্তব্ধ। তারপর একটা আলোড়ন দেখা যায় একদিকে। একজন ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে সামনে। সিরাজকে কুর্নিশ করে সে বলে, 'আমি দিতে পারি, নবাব। টক্‌টকে লাল।'

সিরাজ তার হাত চেপে ধরে, 'তুমি পারো? সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ, নবাবা।'

'এখনই নিয়ে এসো, প্রচুর ছওয়াব মিলবে।'

'ছওয়াব আমি চাই না, নবাব। এ আমার সৌভাগ্য। আমার সৌভাগ্যই আমার ছওয়াব।'

জগৎশেঠ এতক্ষণে এগিয়ে আসেন। তাঁর সম্মানে ঘা লেগেছে। ভ্রূকুটি করে বলেন, 'তুমি অত বড় কাপড় কেন তৈরি করেছিলে? লাল রঙই বা করেছিলে কেন?'

'নবাব আলিবর্দির জন্যই পাঁচ বছর ধরে বুনেছি আমি। কিন্তু তাঁর সমাধির ওপর দেবো বলে তো বুনিনি। বড় আশা ছিল, চেহেল-সেতুনে তাঁর মসনদের ওপর বিছিয়ে দেবো। বর্গীর হাতে যখন পরিবার সমেত মারা পড়ছিলাম, তখন তিনি গিয়ে বাঁচান আমাদের। সেটা কি ভুলতে পারি? নবাবের সে চেহারা চিরদিন আমার চোখে ভাসবে।'

'হুঁ।' জগৎশেঠ চিন্তান্বিত হলেন যেন।

লোকটা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলে, 'আজ সবচেয়ে বড় মসনদের ওপর পেতে দেবো সে কাপড়।'

লোকটা ছুটে চলে যায়। তার ভয়, তার আগেই অন্য কেউ লাল বস্ত্র নিয়ে এসে দেয়।

লাল কাপড়ের সমস্যা মিটলেও সকলের সেটা মনঃপুত হলো না। বিশেষ করে জগৎশেঠের। লোকটা যে কাপড় আনতে ছুটল, তা যত বড় শ্রদ্ধার সামগ্রীই হোক না কেন, তাতে সোনারূপার কাজ থাকবে না। নবাবের কবরের ওপর যেন সাক্ষাৎ উপহাসের মতো দেখাবে।

রাজবল্লভকে জগৎশেঠ সে-কথা বললো। সিরাজ শুনে ফেলে বলে, 'ওই কাপড়েই নবাব বোধহয় সবচেয়ে শান্তিতে থাকবেন, শেঠজী। সাধারণ কাপড় হলে কি হবে, মনের দরদ দিয়ে বোনা হয়েছে, যে! তাছাড়া কারুকার্য ওতে পরেও করে নেওয়া যেতে পারে।'

বেগমসায়েবা সিরাজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

একজন মৌলানা বলেন, 'কিন্তু এই কৃষ্ণবস্ত্রটির কি হবে?'

'ওটা খোসবাগে ওই ঘরে থাকবে। নবাব-বংশ এখনো নির্বংশ হয়নি, পরেক কাজে লাগবে।' মৌলানা সিরাজের কথা শুনে থতমত খেয়ে চুপ করে যান।

একটা কাঠের পেটিকা মাথায় করে লোকটা হাজির হয়। জগৎশেঠ তাচ্ছিল্যভরে সেদিকে এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে যান রাজবল্লভ ও আরও অনেকে। যেন বিরাট এক তামাশা দেখবে সবাই।

কিন্তু ঢাকনা খুলতে যে জিনিস চোখে পড়ে তা দেখে কারও কথা সরে না। গভীর বিস্ময়ে নির্বাক দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে থাকে সেদিকে। মসলিন আর রেশমের অপূর্ব শিল্প—সর্বাঙ্গে সোনার কাজ।

কৃষ্ণবস্ত্রটির জন্যে মনে মনে জগৎশেঠের একটা গর্ব ছিল। কিন্তু পেটিকা থেকে লাল বস্ত্রটি বার করে যখন মেলে ধরা হলো, তখন পাশের ম্রিয়মাণ কালো কাপড়ের চেয়েও জগৎশেঠের মুখ আরও অন্ধকার হয়ে গেল। সকলের অজ্ঞাতে কালো কাপড়ের একাংশ দু'মুঠো দিয়ে চেপে ধরলেন, যেন সবটা মুঠোর মধ্যে নিতে পারলেই তিনি বেঁচে যেতেন। তারপর আস্তে আস্তে একটা আমগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বেগমসায়েবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে উপস্থিত সকলের।

সিরাজ লোকটির দু'হাত চেপে ধরে বলে, 'কিভাবে তৈরি করলে এই জিনিস? তোমাকে দেখে তো ধনী বলে মনে হয় না।'

'আমি সত্যিই গরিব, নবাব। আধপেটা খেয়ে জমিজমা বিক্রি করে আমি আর আমার ছেলে এটা বুনেছি।'

'তুমি ছওয়াব চাও না, কিন্তু তোমার একটা ব্যবস্থা না করলে যে আমার শান্তি হবে না। নবাব হয়ে তোমার কাছে অনুরোধ করছি, চেহেল-সেতুনে একদিন যেও।'

লোকটা আভূমি নত হয়ে বলে, 'আপনার আদেশ মনে থাকবে, নবাব। প্রয়োজন হলে আপনার কাছে নিশ্চয়ই যাবো।'

মন আমার সব সময় ভীতিবিহ্বল। কেন এমন হয় জানি না। সর্বদাই মনে হয়, একটা নিষ্ঠুর হাত এগিয়ে আসছে মুর্শিদাবাদের টুঁটি চেপে ধরতে। ঘুমের ঘোরেও কেঁপে উঠি—চমকে ঘুম ভেঙে যায়।

বর্গীদের অমানুষিক অত্যাচারের মধ্যেও এমন ভয় কখনো পাইনি। তখন উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেও মন ভরতো। যদি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতাম গঙ্গার অগাধ জলরাশির দিকে, তাহলে শান্তি পেতাম। মনে রং ধরতো বাগিচার সৌন্দর্য দেখে। ফলে-নত গাছের অবস্থা দেখে রক্তিম হয়ে উঠতাম।

এখন সবই রয়েছে, অথচ মনে সাড়া জাগে না। প্রথমে ভাবতাম হয়তো সিরাজের ব্যবহারে এমন হয়েছে। কিন্তু তাতে বাগিচার সৌন্দর্য উপলব্ধি না করলেও উদ্দাম আকাশের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যেও অন্যমনস্ক হবো না কেন? গঙ্গার জল যেন টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। তাতে সামান্য শীতলতার কথাও ভাবতে পারি না এখন।

আত্মহত্যা করা হয়ে ওঠেনি। দু'মাসের শিশুকন্যার মুখের দিকে চেয়ে সব কিছু ভুলতে চেষ্টা করি। হুবহু সিরাজের মুখের আদল। দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে যাই। সিরাজকে যেন নতুন করে পেয়েছি।

তবু মাঝে মাঝে সে মুখের দিকে চেয়ে ভয় পাই—ভীষণ ভয় পাই। শিশু যদি কথা বলে ওঠে, কে তুমি? তোমাকে তো চাই না। ফৈজীকে ডাকো।

তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চেপে ধরি তাকে। নিজেকে বোঝাই, এ তো সিরাজ নয়, এ পুরুষও নয়, পুরুষ না হলে কি নিষ্ঠুর হওয়া যায়? কই, আমি তো সিরাজকে ভুলতে পারলাম না। কার জন্যে আমি আত্মহত্যা করিনি? নিজের সন্তানের জন্যে, কখনোই নয়। সন্তানের মধ্যে সিরাজকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাতেই জীবনের ওপর ছেদ টানতে পারিনি। পৃথিবীতে কেউ একথা কি বিশ্বাস করবে?

শিশু কাঁদলে ভাবি, সিরাজই কাঁদছে। নির্দয় পৃথিবীর কাছে অবুঝ নবাব আঘাতের পর আঘাত পেয়ে শিশুর মতো চোখের জল ফেলছে যেন।

সত্যিই কি সিরাজ কাঁদছে না? ফৈজীর সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও তার মুখখানা অমন শুকনো বলে মনে হয় কেন দূর থেকে? তার হাসিতে আগেকার স্বচ্ছতা দেখি না। ভয় হয়, বাংলার কোটি কোটি মানুষের বিপদের ছায়া বাংলার নবাবের মুখে ফুটে উঠেছে।

বাইরের খবর রাখি না। শত চেষ্টাতেও হীরাঝিলের বাইরের জগতের কোনো সংবাদই সঠিকভাবে আমার কানে এসে পৌঁছয় না। যা শুনি হয়তো তা অতিশয়োক্তি কিংবা বিকৃত, অথবা একেবারে মিথ্যে।

তবু সোফিয়ার ক্রূর হাসির মধ্যে সেদিন বড় বেশি অর্থ খুঁজে পেয়েছিলাম। বহুদিন সে মুর্শিদাবাদে ছিল না। মহম্মদের সঙ্গে ঢাকা গিয়েচিল। তার মহম্মদের আজকাল পদোন্নতি হয়েছে। আলিবর্দির বেগমের সেই করুণাশ্রিত লোকটির সঙ্গে নিজেকে তুলনা করলাম। মহম্মদের পদোন্নতি হলেও সে লুৎফার পায়ের কাছেও কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না। হতে পারি আমি নবাবের পরিত্যক্তা এক নারী—তবু আমি বেগম। হীরাঝিলের বেগম মহলে আমার বাস, যেখানে নবাবের প্রিয়তমা ফৈজী অবধি দ্বিধাবোধ করে প্রবেশ করতে।

বেগম ফৈজীর মহল হীরাঝিলের একপাশে। সেটা বেগমদের বসবাসের জন্য তৈরি হয়নি। আমার প্রতি সিরাজের কেন যে এই অনুকম্পা, শত ভেবেও বুঝতে পারিনি। শুধু বুঝতে পারি, তার মন থেকে আমি একেবারে সরে গেলেও সম্মানের আসনে আগের মতোই প্রতিষ্ঠিত। সে সম্মান কেড়ে নিতে সম্ভবত তার বিবেকে বাধে। তার প্রথম সন্তান যে আমারই গর্ভের। তবে এটুকুই জানি, সে মেয়ে না হয়ে যদি ছেলেও হতো, তবু বাংলার মসনদে কখনো বসতে পারতো না। বাংলার মসনদ ফৈজীর গর্ভের এক অনাবিষ্কৃত অঙ্কুরের জন্য স্থির হয়ে রয়েছে।

সোফিয়াকে হাসতে দেখার পর থেকে আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। তার কথাবার্তা আদব-কায়দার মধ্যে কোনো অভদ্রতা খুঁজে না পেলেও একটা বিদ্রূপ প্রকাশ পাচ্ছিল, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাকে কিছু বলতে পারিনি সেজন্যে।

একসময় যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার উপস্থিতি, বলেছিলাম, 'ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কি সোফিয়া বিবির এত আনন্দ?'

'ঠিক বলেছেন, বেগমসায়েবা। দিন মানুষের সমান যায় না, কত ওঠানামা হয়।'

'তুমি তো ওঠার দলে?'

'হ্যাঁ, নবাবের অনুগ্রহে।'

'আর নবাব নিজে কোন দলে?' সোফিয়ার চোখের দিকে তীব্রভাবে তাকাই কিছু খুঁজে পাবার আশায়। আমার দৃষ্টির সম্মুখে সে ম্লান হয়ে যায়। কোনো কথা বলে না।

'জবাব দিলে না যে?'

'নবাবের কথা এর মধ্যে কেন, বেগমসায়েবা?' তার গলা কেঁপে ওঠে।

'নবাবও মানুষ, সোফিয়া।'

'ঠিকই বলেছেন, বেগমসায়েবা। নবাবও মানুষ। আমি এখন যাই।'

সোফিয়া চলে যাবার উপক্রম করতে আমি চীৎকার করে উঠি, 'দাঁড়াও।'

সে থমকে দাঁড়ায়। তার ধৃষ্টতা দেখে আমার শরীর রাগে রি-রি করে।

'কি বলতে চাইছো তুমি, সোফিয়া?'

'কিছুই না তো, বেগমসায়েবা।' সে অবাক হবার ভান করে। কথা বার করা অসম্ভব।

'বেগমের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কুর্নিশ করে যেতে হয়, সে-কথা ভুলে গিয়েছো?'

'অপরাধ মাপ করবেন, বেগমসায়েবা।' বিকৃত মুখে কুর্নিশ করে সে বিদায় নেয়। এরপর থেকেই মনের মধ্যে সব সময় আনচান করে। সঙ্গী সাথী কেউ নেই, যাকে দিয়ে বাইরের খবর আনাতে পারি। ঘরের মধ্যে বসে ছট্‌ফট্ করা ছাড়া উপায় নেই।

নবাব-পরিবারের যত কিছু অনাচার, ব্যভিচার আর কুৎসিত দৃশ্য সব কি শুধু আমারই চোখে পড়ে? এ পোড়া চোখকে উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার মতো নারীকে হিন্দুরা কি একটা বলে যেন, ঠিক জানি না। তবে সেটা প্রশংসার নয়। ঘসেটির ঘটনা দেখেছিলাম, আমিনা বিবির পদস্খলনও

নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু এবার যা চোখে পড়ল তা আগের সব কিছুকে ছাড়িয়ে নারীর ঘোরতর কলঙ্কের এক ইতিহাস রচনা করল। নিজের চোখকেও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু একদিন নয়, দু'দিন নয়, তিনদিন একই রকম ভুল দেখা কখনো সম্ভব নয়।

নিজে নারী বলে আমারই মরে যেতে ইচ্ছে হলো। পুরুষের একান্ত নির্ভরশীল প্রেমের এমন জঘন্যতম প্রতিদান কেউ কখনো দিতে পারে? কুৎসিততম পুরুষের প্রেমেও যদি খাদ না থাকে, তাতে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে বলেই এতদিন জানতাম, কিন্তু সে ধারণা ধূলিসাৎ হলো। নিদারুণভাবে তা ভেঙে গেল, যখন দেখলাম, শয়তানীর পাল্লায় পড়লে শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রেমও কেমন বৃথা হয়। পুরুষের নিষ্ঠুরতা এর চাইতে শতগুণে শ্রেয়। তাতে লুকোচুরি নেই, পেছন থেকে ছুরিমারা নেই। সে নিষ্ঠুরতা সকলের চোখের সামনে সোজাভাবে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায়।

সিরাজের মুখখানার কথা ভেবে অসহনীয় ব্যথায় বুকের ভেতর টন্‌টন্ করে। তার সন্তানকে বুকের মধ্যে নিয়ে কাঁদি—শুধু কাঁদি। কেঁদেও যেন শান্তি পাইনে। শান্তি পেতে হলে এখনই সিরাজকে গিয়ে সব বলতে হয়। কিন্তু তার মনের মধ্যে তিল-তিল করে গড়ে ওঠা সৌধকে আমি ভেঙে চুরমার করে দিতে পারবো না—কিছুতেই নয়।

অথচ এতে আমার একটা হিংস্র আনন্দ হওয়াই উচিত ছিল। সিরাজও একসময় আমার সম্বন্ধে সেরকম একটা কিছু ভেবেছিল। এখনো নিশ্চয়ই তার সেই ধারণাটাই অটুক রয়েছে। অনেক বেগম ঘাঁটাঘাঁটি করে সে মেয়েদের মন সম্বন্ধে একটা ছক কেটে নিয়েছে। আমাকে সে সেই ছকের মধ্যেই ফেলে।

বেচারা সিরাজ! এই তিনদিনেব ঘটনা এখন তাকে বলতে গেলে সে বিশ্বাসই করবে না। উল্টে আমাকে হয়তো হত্যা করার আদেশ দিয়ে বসবে।

কিন্তু, তবু বলাই যে উচিত। সারাদিনের পরিশ্রমের পর যখন সে ফৈজীকে নিয়ে মত্ত হবে, তখন আমি কি তা সইতে পারবো? ফৈজীর হাসির মুখোশ আর আহ্লাদে গলে-যাওয়া-ভাব দেখে কি স্থির থাকতে পারবো আমি? স্থির না থেকে উপায়ও নেই, সিরাজ দারুণ আঘাত পাবে।

দীর্ঘদেহ, আগুনের মতো গায়ের রং সেই পুরুষের। নবাবের একান্ত বিশ্বাসী আর প্রিয়পাত্র। হবে নাই বা কেন? সৈয়দ মহম্মদ খাঁ তো পর নয়। সিরাজের ভগ্নীপতি সে।

যত কিছু সর্বনাশ সবই দেখছি এই আত্মীয় আর বন্ধুর রূপের মধ্যে দিয়েই আসে। সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে দেখে কয়েক বছর আগে আর-এক বীরপুরুষের কথা মনে পড়ে। হোসেন কুলিখাঁর জন্যে এখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলি। তাঁকে কখনো অপরাধী বলে মনে হয় না। ঘসেটি যেদিন আমাকে পদাঘাত করেছিল, সেদিন তিনি যেভাবে আমাকে রক্ষা করেছিলেন, তা আজও আমার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। তাঁর সেই সহানুভূতিপূর্ণ সম্বোধন এখনো কানে বাজে। দুর্ভাগ্য যে, তিনি আমিনা বেগম আর ঘসেটির লালায় বোনা জালের মধ্যে এসে আটকে পড়েছিলেন। গবাক্ষের ধারে তাঁর চোখ-মুখের অসহায় আর বিরক্তির ভাব আর কেউ না দেখুক, আমি দেখেছিলাম। নারীদেহের সংস্পর্শে এসে সাময়িকভাবে তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেটা তার ধীরবুদ্ধি আর বিবেচনা প্রসূত কার্য নয়। জালের মধ্যে পড়ে অন্য কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ফৈজীর সঙ্গে সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে দেখে আমার হোসেন কুলিখাঁর কথাই মনে হয়েছিল। সেও হয়তো এমন পরিণতির কথা কখনো কল্পনা করেনি। কিন্তু তার দীর্ঘ ঋজু গৌরবর্ণ দেহখানা ফৈজীর নেশা ধরিয়েছে। শিকারকে বশে আনার জন্যে কথার ভঙ্গী আর কটাক্ষের ফাঁদ পেতে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। এই তিনদিনে তারই পরিণতি দেখলাম।

পুরুষ মানুষ ইচ্ছে করেই ফাঁদে পা দেয় অনেক সময়। অন্তত সিরাজের স্বভাব দেখে আমার সেই ধারণাই হয়েছে। কারণ ব্যভিচারের ফলাফল তাকে ভোগ করতে হয় না বড় একটা। ফাঁদে পা দিতে

হলে বিপদের ঝুঁকি থাকে, কিন্তু সেই ঝুঁকি সম্ভবত পুরুষকে আরও উৎসাহিত করে। সাদামাটা কি একঘেয়েমির মধ্যে সে ঠিক তৃপ্তি পায় না।

ফৈজী নারী, কিন্তু তার মন নিশ্চয়ই পুরুষোচিত। নইলে সে কি কল্পনা করতে পারছে না, নিজের কত বড় সর্বনাশ সে ডেকে আনছে?

প্রথমে হয়তো সে এতটা ভেবে দেখেনি। কিন্তু সৈয়দ মহম্মদ যখন তাকে পাগল করল, তখন সব ভেবেও আর পিছিয়ে আসতে পারছে না। ফৈজী মহামূর্খ। সিরাজকে সে চিনতে পারেনি।

মেয়েটাকে হামিদার কাছে রেখে ধীরে ধীরে হীরাঝিলের ছাদে গিয়ে উঠি।

সিরাজ এখনো ফেরেনি চেহেন-সেতুন থেকে। কোনোদিন তো এত দেরি করে না, তাই ভাবনা হয়। এখন তার জন্যে ভাবনাটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে, প্রতিকারের উপায় নেই। আগের মতো আমার কাছে এলে কি একদিনও দেরি করে ফিরতে দিতাম? এখন লুৎফা নামে একজন নারী যে হীরাঝিলে বাস করে, একথা হয়তো তার মনেই নেই। তবু নেপথ্যে থেকে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তার গাড়ির ঘোড়ার খুরের আওয়াজের জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। সে ঠিক সময়ে না এলে চিন্তিত হই।

ছাদ থেকে গঙ্গার অপর পারে মতিঝিলের চূড়া দেখা যায়। ঘসেটি বেগম রয়েছে সেখানে।

হাসি পেল ঘসেটি বেগমের কথা মনে হওয়ায়। নওয়াজিসকে নবাব করার বহু চেষ্টাই সে করেছে, কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো।

গাড়ির আওয়াজ পাই। মন্থরগতিতে সিরাজের গাড়ি ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তার গাড়ির এমন ধীরগতি দেখে মন খারাপ হয়। অসুস্থ নয় তো সিরাজ? আস্তে গাড়ি চালানো মোটেই পছন্দ করে না সে। সর্বদাই সে চায় উল্কার বেগ।

ছাদ থেকে নেমে তার কক্ষের পাশে লুকিয়ে থাকি। ফৈজীর ঘরে প্রথমে না গেলে সে এখানেই আসবে। কান পেতে দাঁড়াই।

পায়ের শব্দ পাই। জানি, আমি তার সম্মুখে যাবো না। তবু বুক দুরুদুরু করে। এত কাছ থেকে অনেকদিন দেখার অভ্যাস নেই তাকে। সিরাজ আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার গায়ের বাতাস এসে লাগবে আমার গায়ে। তখন তার শরীরের সুপরিচিত গন্ধ পাবো আমি। কিন্তু যদি কেঁদে ফেলি?

একটা থামেব গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। নিজের পায়ের ওপর নির্ভর করা এক্ষেত্রে নিরাপদ নয়।

সিরাজ আরও কাছে এগিয়ে আসছে। কেমন যেন ঢিমেতালে হাঁটছে—মোটেই স্বাভাবিক নয়। নিজের মহলের মধ্যেও সে হাঁটে যুদ্ধক্ষেত্রের বীর যোদ্ধার মতো দ্রুত এবং সমান তালে। তার সেই রকম চলন দেখতে সবাই অভ্যস্ত। নবাব আলিবর্দির কাছে তার শপথের কথা ভোলেনি তো? শরাব ধরল নাকি আবার?

উঁকি না দিয়ে পারি না। সিরাজের ফৈজী থাকতে পারে, থাকতে পারে তার হাজারটা বেগম—রাজত্ব থাকতে পারে, সৈন্যসামন্ত থাকতে পারে, কিন্তু সে যে একান্তই আমার। তাকে আর কেউ চিনবে না, কেউ বুঝবে না, ভালোবাসতেও পারে না তাই।

তার মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠি। একি চেহারা হয়েছে, অসুখ করেনি তো? চোখ দুটো লাল হলেও বুঝতে কষ্ট হলো না যে নেশার লাল নয়।

নিজের অজ্ঞাতে কখন যে তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম জানি না। একেবারে তার সামনে গিয়ে খেয়াল হলো। সিরাজও আগে আমাকে দেখতে পায়নি। যখন দেখলো, তখন আর পালিয়ে যাবার উপায় নেই আমার।

'কে?' চমকে ওঠে সে।

আমি জবাব দিতে পারি না। লজ্জায়, দ্বিধায় সমস্ত শরীর মন জড়িয়ে আসে।

'লুৎফা?'

'হ্যাঁ, নবাব। এখনো বেঁচে আছি।'

'জানি। আমার আগে তুমি মরতে পারো না।' উদার কণ্ঠস্বর তার। তবু তার মধ্যে এমন একটা কিছুর স্পর্শ ছিল যা আমাকে আনন্দ দিল।

'ক্ষমা করবেন, নবাব। আপনার মুখের দিকে চেয়ে স্থির থাকতে পারিনি। নইলে আড়ালেই থাকতাম। সে চেষ্টা করেও ছিলাম।'

'আমার চমকে ওঠা ভুল হয়েছিল। বোঝা উচিত ছিল, তুমি আজ আসবে।'

'কেন নবাব?'

'সুখের সময়ে আড়ালে থেকে নজর রাখো, আর দুঃখের সময় দেখা দাও। আর একজনও এমনি আছে। তবে সে নারী নয়, পুরুষ। সে মোহনলাল।'

'দুঃখ! কিসের দুঃখ আপনার?'

'সাধারণ দুঃখে নবাবদের ভেঙে পড়তে নেই, তাই না, লুৎফা। আমার পিতা নিহত হলে তুমিই একথা বলেছিলে একদিন।'

আমার কথার এতখানি গুরুত্ব দেয় সিরাজ! কবেকার কথা এখনো মনে রেখেছে? আনন্দে চোখ ছাপিয়ে জল আসতে চায়।

'আপনার কি হয়েছে বলুন।'

'এক্রাম মারা গেল।'

স্তব্ধ হয়ে যাই। নওয়াজিস মহম্মদ এক্রামকে মানুষ করলেও ভাই-এর ওপর সিরাজের দরদ কারও অজানা নয়। কী সান্ত্বনা দেবো ভেবে পাই না।

'মতিঝিলেই তাকে গোর দেওয়া হলো।' সিরাজ ধীরে ধীরে বলে।

'আমি খবর পেলাম না?'

'ইচ্ছে করেই তোমাকে জানাইনি। অসুখটা ছোঁয়াচে—বসন্ত। তোমার মেয়ে রয়েছে.....'

মেয়ের কথা তাহলে সে ভোলেনি, আমাকেও ভোলেনি। তবু আমার সঙ্গে দেখা করে না। জন্মানোর পর মেয়ের মুখও দেখেনি এ পর্যন্ত। আশ্চর্য! নবাবরা সত্যিই সাধারণ মানুষ নয়।

'ঘরে চলুন, নবাবজাদা।'

'তুমি যাবে?'

'আপনি আপত্তি করলে যাবো না। ফৈজী বেগমের কাছে খবর পাঠাবো?' মুখে ফৈজীর কথা বললেও মনে মনে নবাবের কাছে থাকতে চাইছিলাম। আজকের দিনে তাকে আর কারও কাছে রাখতে মন চাইল না।

সিরাজের জবাবের অপেক্ষায় তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। ভয় হলো যে, আমার কথামতো হয়তো সে ফৈজীকে খবর পাঠাতে বলবে।

'তুমি ফৈজীকে ডাকতে চাও, লুৎফা?'

'আপনার অভিরুচি।'

'আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই। তুমি এখানে না এলেও তোমার ঘরে যেতাম। এসব দিনে ফৈজীর কথা মনেও আসে না।

মনে মনে বলি, জীবনেও তার কথা মনে আসা উচিত নয়। সে শয়তানী। সে ঘোর পাপিষ্ঠা। সে অবুঝ যুবকের মন নিয়ে সাংঘাতিক খেলায় মত্ত হয়েছে।

মুখে বলি, 'মেয়েরা বড় নীচমনা, নবাব। আমাকে আপনার বিপদের দিনের প্রলোভন দেখাবেন

না। শেষে হয়তো আল্লার কাছে শুধু সেইসব দিনেরই প্রার্থনা করবো।'

সিরাজ গম্ভীর হয়ে বলে, 'তুমি তা পারবে না। তবে প্রার্থনা করার আর প্রয়োজন হবে না, লুৎফা। সেদিন আসছে, আর একটু ধৈর্য ধরো।'

সিরাজের হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাই।

মতিঝিলের সুন্দর বাগিচার এক নির্জন কোণে মাটির নিচে সিরাজের ভাই এক্রামউদ্দৌলা একাকী শুয়ে রইলো। কিশোর এক্রামের কিশোরী বেগম নাকি তার শিশুপুত্রকে নিয়ে প্রতিদিন তার স্বামীর কবরের পাশে কাঁদতে বসে। পিশাচী ঘসেটির প্রাণে কিশোরীর এই ব্যথা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেছে বলে বোধ হয় না। তার সম্বন্ধে নানারকম গুজব হীরাঝিলের কঠিন পাহারা ভেদ করে এখনো আমার কানে আসে।

আজকাল মতিঝিলে নাকি রাজবল্লভের ভারী আদর। হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যু ঘটিয়ে ঘসেটির হাত পেকেছে।

নওয়াজিস মহম্মদের জন্যে কষ্ট হয়। সে তার বেগমের ঠিক বিপরীত। ঘসেটি হয়তো বাংলার মসনদের লোভ এখনও ত্যাগ করেনি। হয়তো কেন, সঠিক ভাবেই একথা বলা যেতে পারে। কারণ, রাজবল্লভ যেখানে যায়, সেখানে ষড়যন্ত্র না হয়ে পারে না। কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেও বলা যায়, নওয়াজিস এ সবের মধ্যে নেই।

হামিদা একদিন এসে বললো যে, নওয়াজিস নাকি পাগলের মতো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে হামিদা এরকম দু'চারটে খবর শুনে এসে আমাকে বলে।

সে বলল, এক্রামের বেগম কেঁদে ভাসায়, আর নওয়াজিস দু'হাত দিয়ে কবরের পাশের মাটি আঁচড়ায়। মাটি খুঁড়ে সে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তবু যদি নিজের ছেলে হতো।

নওয়াজিস নাকি আর বাঁচবে। না। তার 'শোথ' মারাত্মক রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। হাকিম দেখাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। যার বেগম উদাসীন, তাকে আর দেখবে কে? তার কঙ্কালসার চেহারার প্রতি ঘসেটির আকর্ষণ থাকার কোনো কারণ নেই। তার চেয়ে রাজবল্লভ অনেক বেশি লোভনীয়। সে ষড়যন্ত্র করে, পরামর্শ দেয়। নওয়াজিসের মতো সরল-মূর্খ সে নয়। তার ওপর তার দেহ রক্তমাংসে ভরপুর, ঠিক হোসেন কুলিখাঁ যেমনটি ছিলেন।

মাঝে মাঝে ভাবি, ঘসেটি বেগম যদি মেয়ে না হয়ে নবাব আলিবর্দির পুত্র হয়ে জন্মাতো, তাহলে দাদুর শত আদরের নাতি হলেও সিরাজ কখনো মসনদে বসতে সক্ষম হতো না। যে ক্ষুরধার বুদ্ধি, প্রভাব বিস্তারের যে অপরিসীম ক্ষমতা, যে নিদারুণ কুটিলতা আর নির্মমতা ঘসেটির রয়েছে, তা যে কোনো পুরুষকে সার্থক নবাব হতে সহায়তা করে।

কিন্তু ঘসেটি নারী, তাই রক্ষা। সে পুরুষ হলে বাংলার ইতিহাস অন্যরকম হতো। নবাব আলিবর্দি তাহলে শেষদিন পর্যন্ত মসনদে থাকতেন না নিশ্চয়ই। সাজাহানের মতো কোনো দুর্ভেদ্য দুর্গে বসে সঙ্কীর্ণ গবাক্ষের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাঁর জীবন শেষ হতো।

পুরুষ হতে হতে নারী হয়ে জন্মেছে ঘসেটি, তাই নারী হতে হতে পুরুষ হয়ে জন্মানো নওয়াজিসের প্রতি শুধু বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু সঞ্চিত নেই তার হৃদয়ে। মনে হয়, প্রথম কৈশোরে সে যখন নওয়াজিসকে পছন্দ করে শাদি করেছিল, তখন তার মেয়েলি মনের পুরুষোচিত কাঠিন্য নওয়াজিসের পুরুষ-মনের নারীসুলভ মিষ্টত্ব দেখে ভুলেছিল। তারপর যখন ঘসেটির দেহ যৌবন-জলতরঙ্গে পরিপূর্ণ হলো, তখন তার ভুল ভাঙল। সে বুঝল, তার দেহ-মনের পরিতৃপ্তির জন্যে আরও

নিষ্ঠুর নির্মম শক্তিশালী পুরুষের প্রয়োজন।

মতিঝিলের প্রাসাদ থেকে এক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পক্ষবিস্তার করে বাংলার সৌভাগ্য সূর্যকে ধীরে ধীরে গ্রাস করার চেষ্টা করছে, সিরাজের মুখ দেখে সেকথা স্পষ্ট অনুমান করি। মুখে সে কিছু বলে না, কিন্তু অন্তরে সে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তার মস্ত প্রমাণ হলো এই যে, ফৈজীকে এখনো পর্যন্ত বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। সৈয়দ মহম্মদ খাঁর ঘন-ঘন হীরাঝিল পরিদর্শনকে সে অস্বাভাবিক বলে মনে করতে পারেনি।

তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী সিরাজের দৃষ্টি এড়িয়ে এ সমস্ত ঘটনা কখনোই ঘটতো না, যদি তার চিত্ত স্থির থাকতো। বুঝলাম, বাংলার মসনদ নিয়ে তার মনে ঝড় বইছে। হারেমের বাইরে যাদের চিরকাল বন্ধু বলে, আত্মীয় বলে জানে, তাদের ওপর এক ঘোর অবিশ্বাস তার মন ছেয়ে ফেলেছে—সে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই মনকে যেখানে মেলে দিয়েছে, সেখানে আর একই বিষয়ে দেখতে সে চায় না। হারেমে সে শান্তি চায়। তাই দুর্বহ চিন্তাভাবের মধ্যেও ফৈজীর কৃত্রিম হাসিতে এখনো সে মুগ্ধ, বিগলিত হয়। আগের মতোই হীরাঝিলের জলাশয়ে গভীর রাত পর্যন্ত এখনো তার বজরা ভাসে। সেই বজরা থেকে ফৈজীর নূপুরধ্বনি ভাসতে ভাতে গঙ্গার ডিঙি নৌকার মাঝি-মাল্লাদেব কানে গিয়েও পৌঁছায়। বাইরের কাঠামোটুকু ঠিকই বজায় রয়েছে, কিন্তু ভেতরে মস্ত ফাটল। বাইরে আর ভেতরে সিরাজ সর্বস্বান্ত হতে বসেছে।

ভেবে ভেবে রাত্রে নিদ্রা নেই আমার। মেয়েটার ফুলের মতো ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে তারই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একের পর এক বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিই।

ফৈজীর কথা সিরাজকে শত চেষ্টাতেও বলতে পারিনি। সে বড় আঘাত পাবে। শুধু আঘাত নয়, এমন কোনো কাণ্ড সে করে বসবে, যা হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যুর চাইতেও ভয়ঙ্কর।

তবু ইচ্ছে করেই একদিন সিরাজের চলার পথের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফৈজীর ঘরের দিকে যাচ্ছিল সে। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। অবাক হলো। এভাবে কখনো তার পথের মধ্যে এসে আমি দাঁড়াইনি। বিশেষ করে তার তনুমন যখন শুধু ফৈজীকেই চাইছে। কিন্তু এক্রামউদ্দৌলার মৃত্যুতে একদিনের জন্যেও আমাদের পূর্বের সম্পর্কের যেটুকু উন্নতি হয়েছিল তাতে আমার সাহস বেড়েছে। কারণ, সিরাজের মনটা বহুদিন পরে সেদিন আবার স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল আমার কাছে।

'কিছু বলতে চাও, লুৎফা?'

'তেমন কিছু নয়, পরেই বলবো।'

'না, এসেছো যখন বলো।'

ফৈজীর কথা নয়, মতিঝিলের কথা বলার জন্যে প্রস্তুত হই। সেখানে রাজবল্লভ আর জগৎশেঠের প্রতিদিনের জলসা আমার ভালো লাগেনি। তবু সিরাজকে স্পষ্ট বলতে সঙ্কোচ হয়। সে হয়তো ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবে, কিংবা বিরক্ত প্রকাশ করবে, এসব ব্যাপারে আমার মতো সামান্য নারীর মাথা ঘামানোর জন্যে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে অধৈর্য হয়, 'বলছো না কেন?'

ঢোক গিলে বলি, 'বলছিলাম মতিঝিলের কথা।'

'কি হয়েছে মতিঝিলে?'

'জগৎশেঠ আর রাজবল্লভ সেখানে যাতায়াত করেন শুনেছি। এটা কি ভালো?'

'আশ্চর্য!'

'ক্ষমা করবেন, নবাব। সন্দেহ হলো, তাই না বলে থাকতে পারলাম না। কিছুই তো বুঝি না।'

'তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি বোঝো। তাই অবাক হচ্ছি।'

বিদ্রূপ করছে নিশ্চয়ই। তার সামনে থেকে সরে যেতে পারলেই বাঁচি। বলি, 'আমি যাই, নবাব।'

'না, শোনো।'

যেতে গিয়ে থেমে গেলাম। পা কাঁপতে শুরু করলো। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করতে লাগলাম, এইবার সে রাগে ফেটে পড়বে। কী কুক্ষণেই যে এত কথা বলতে গিয়েছিলাম, তাও আবার সে যখন ফৈজীর কাছে যাবার জন্যে ছুটছে।

কিন্তু রাগের লক্ষণ দেখলাম না তার চোখে-মুখে। আমার কাছে এগিয়ে এসে সে আমার কাঁধের ওপর তার ডান হাত রেখে বলে, 'তোমার দুটো চোখ ছাড়াও আর একটা চোখ আছে, লুৎফা। সে-চোখ সবার থাকে না। নবাব-বাদশাদের সে-চোখ থাকা ভাগ্যের কথা।'

এ তো বিদ্রূপ নয়। তার কথায় আর স্পর্শে অবশ হয় আমার দেহ-মন। শুধু মাথা নীচু করে প্রাণভরে আস্বাদ করি তার স্পর্শসুখটুকু। কতদিন সে নিজে থেকে আমার কাঁধে হাত দেয়নি এভাবে।

'লুৎফা।'

'বলুন নবাব'।

'তুমি ঠিকই ধরেছো। এক্রামের ছেলেকে ওরা নবাব করতে চায়। কলকাতা আর কাশিমবাজারে ইংরেজদের কাছে খবর পাঠিয়েছে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে। তারা নাকি রাজিও হয়েছে।

'কী সাংঘাতিক?' আর্তনাদ করে উঠি।

'সাংঘাতিক কিছুটা বৈকি। তবে, এ জাতীয় চক্রান্ত সব নবাবের জীবনেই আসে। ঘাবড়ালে তো চলবে না।'

'তবু এত জেনেশুনেও চুপ করে আছেন আপনি?'

'কারণ আছে। অনুমান করতে পারো নিশ্চয়ই।'

'শেঠ আর রাজাকে ঘাঁটাতে চান না।'

'সাবাস্!' সিরাজ আমার দুই কাঁধের ওপর তার দুই হাত বিস্তৃত করে দিয়ে বলে, 'ঠিখ ধরেছো। কিন্তু আরও একজন রয়েছে, সেখানেই বিপদ।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি।

সে বলে, 'এবার অনুমান করতে পারবে না।'

সত্যি অনুমান করতে পারি না।

সিরাজ বলে, 'আরব দেশের নবাবের রক্ত যার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে।'

'কে সে?'

'মহামান্য মীরবক্সীকুল।'

'মীরজাফর?'

সিরাজ শুধু মাথা ঝাঁকায়।

কিছুক্ষণ পরে বলি, 'তবু এ চক্রান্ত ভেঙে দেওয়া যায়, নবাব।'

'হ্যাঁ জানি, তাই করবো।'

'ঘসেটি বেগম.....'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঘসেটি বেগমকে মতিঝিল থেকে সরিয়ে আনবো। সে থাকবে আমারই হীরাঝিলে আমার চোখের সামনে। বড় বেশি লোভ তার। এক্রামের বাচ্চাটাকে নামে নবাব করে ক্ষমতালাভের আশা তাকে পেয়ে বসেছে। এত বেশি আশা করা ভালো নয়।'

সিরাজ আমার কাঁধ থেকে হাত দুটো তুলে নেয়। কাঁধ ব্যথা করে। অন্যমনস্ক হয়ে বড় বেশি ভর

দিয়েছিল সে। ফৈজীর ঘরের দিকে না গিয়ে সে ফিরে যায় নিজের ঘরে। তার আজকের বৈকালের আনন্দ আমার জন্যে মাটি হলো।

নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ মারা গেল।

এক্রামকে আর একা থাকতে হবে না। নওয়াজিসকেও আর তার কবরের পাশে মাটি আঁচড়াতে দেখা যাবে না পাগলের মতো। জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির পাশে সেও আশ্রয় নিল। ছেলেবেলায় বাপ-মায়ের স্নেহ সে পেয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু জীবনের বাকি সময়টা তার কেটেছে নিদারুণ অভিশাপের মধ্যে। তার তৃষিত হৃদয় আজীবন মরল শুধু ছট্‌ফট্ করে। স্ত্রীর ভালোবাসা কখনো সে পায়নি। কর্মচারীদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেনি সে। তার জীবন-মরুভূমির একমাত্র মরুদ্যান ছিল এক্রাম। সে-মরুদ্যান যখন শুকিয়ে গেল, তখন সব অবলম্বনই সে হারিয়ে ফেললো।

নওয়াজিসের দেহ মতিঝিলের শীতল মাটির নীচে গিয়ে খুবই শান্তি পেয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও শান্তি পেল বোধহয় ঘসেটি নিজে। জীবনের একটি অযাচিত বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

তার স্বস্তির কথা ভেবে মনে মনে কৌতুক অনুভব করি। জানি, বেশিদিন আর তাকে মতিঝিলে বাস করে সর্বনাশকর চক্রান্তে লিপ্ত থাকতে হবে না। সিরাজ ইতিমধ্যেই মতি স্থির করে ফেলেছে। অবসর মতো একটা দিন দেখে সে ঘসেটিকে হীরাঝিলে চলে আসবার জন্যে জানাবে আমন্ত্রণ। সে আমন্ত্রণ যদি ঘসেটি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সামান্য একটু শক্তিপ্রয়োগ। শক্তিপ্রয়োগ করতে হতো না যদি ঘসেটির টোপের নবতম মৎস্য মীর নজরালির উদয় না হতো ইতিমধ্যে। রাজবল্লভের চেয়েও তার আদর নাকি এখন অনেক, অনেক বেশি মতিঝিলে। রাজবল্লভের বেলায় কুর্নিশ, আর নজরালির বেলায় কদমকেশী—নফর আর জারিয়াদের প্রতি কড়া হুকুম ঘসেটির।

যোদ্ধা বলে নজরালির খ্যাতি আছে। সিরাজ বলেছিল, সামান্য কিছু সৈন্যও সে নাকি জমা করে রেখেছে মতিঝিলে। কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে, নজরালি শুধু যোদ্ধাই। ধূর্ততা বলে কিছু নেই তার মধ্যে। কিংবা এও হতে পারে যে, সে অতিরিক্ত ধূর্ত, ঘসেটির মন রেখে যতদিন মধুপান করা যায়। সেটাই সম্ভব। কারণ, নিজে যোদ্ধা হয়ে তার পক্ষে সিরাজের পরাক্রম না জানা অসম্ভব।

মতিঝিল আক্রমণ যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে, তাহলে দেখা যাবে, সে-ই সর্বপ্রথম সিরাজের পায়ের ওপর এসে পোষা কুকুরের মতো লুটিয়ে পড়েছে। ঘসেটি হীরাঝিলে চলে এলে মধুপান করা যখন আর সম্ভব হবে না, তখন কেন শুধু শুধু নবাবের সঙ্গে শত্রুতা করা। বিশেষত যে নবাব শৌর্য, বীর্য আর পরাক্রমে অসাধারণ। সিরাজের বাহুবল শত্রুদের জানতে বাকি নেই। তাই তলে তলে এত আয়োজন। সে যদি সরফরাজ হতো, তাহলে এই সমস্ত গোপনীয়তার প্রয়োজন হতো না কখনই।

দেশের যাঁরা মাথা, যাঁদের হাতে দেশের চাবিকাঠি, তাঁরা সকলে সিরাজের বিপক্ষে থেকেও সহজে কিছু করতে পারছেন না। মীরজাফর মীরবক্‌সীকুল না হয়ে আজ মোহনলাল যদি সে পদে থাকতেন, তাহলে জগৎশেঠ আর রাজবল্লভ কেঁচোর মতো মাথা নীচু করে থাকতো। ইংরেজরা তাহলে এতদিনে জাহাজে গিয়ে উঠতো, কিংবা সমুদ্রে ডুবতো।

নিজের শয়নকক্ষে মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করছিলাম, আর এসব কথা ভাবছিলাম। হামিদা হন্তদন্ত

হয়ে ছুটে এলো।

'কি হয়েছে, হামিদা?'

'নবাব আপনাকে ডাকছেন।' তার চোখে-মুখে ভীতির চিহ্ন পরিস্ফুট।

'তিনি চেহেল-সেতুন থেকে ফিরলেন কখন?'

'এই মাত্র।'

'এ সময়ে তো ফেরেন না তিনি। কোথায় আছেন?' মেয়েটিকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি।

'ফৈজী বেগমের ঘরে।'

'সেকি! সেখানে আমাকে যেতে বলেছেন? ঠিক বলছো তো?'

'হ্যাঁ, বেগমসায়েবা।'

'কিন্তু সেখানে কেন যাবো?'

'ফৈজী বেগম ঘরে নেই।'

'নেই!' আমার পা কাঁপতে শুরু করে। তার সেখানে না থাকার গূঢ় কারণ রয়েছে। যদি সত্যি হয়, তাহলে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে যাবে অতি শিগ্‌গির। কেউ রোধ করতে পারবে না। ফৈজীর ঘরে এখন গেলে সিরাজ হয়তো আমাকেই হুকুম করবে তাকে খুঁজে বার করার জন্যে। আমি তা পারবো না— কিছুতেই নয়। আমি অনুমান করতে পারি, ফৈজী এখন কোথায় রয়েছে, কার সঙ্গে রয়েছে। অনুমান করতে পারি বলেই আমি নবাবের হুকুম তামিল করবো না।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে ঘর ছাড়তে আমার দেরি হয়ে গেল। বাইরে সিরাজের পায়ের শব্দ পেলাম।

'হামিদা মেয়েটাকে নিয়ে শিগ্‌গির দরজার আড়ালে যা।'

হামিদা লুকোতেই সিরাজ প্রবেশ করে। তার চেহারার বর্ণনা আমি দিতে পারবেনা না। তবে এইটুকু বলতে পারি, অমন ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা জীবনে দেখিনি।

'তুমি নিশ্চয়ই জানো, লুৎফা?' নবাব চেঁচিয়ে ওঠে।

'কিসের কথা বলছেন, নবাব?' চোখে-মুখে যতটা পারি অজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিনয় আজ করতে হবে।

'ফৈজী কোথায় রয়েছে?'

'তার ঘরে নেই?'

'না নেই। আর এ সময় সে কোনোদিন থাকে না, সে খবরও সংগ্রহ করেছি। কোথায় যায় সে? বেগম হয়ে আমার অজ্ঞাতে কোথায় যায় সে? হীরাঝিলের বাইরে?' নবাব আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করে।

'আমি তো কিছু জানি না।'

'তুমি সব জানো। লুৎফা বেগমের চোখের আড়ালে দেশে কিছু ঘটতে পারে না, হীরাঝিল তো দূরের কথা।'

পা দুটো বড় বেশি কাঁপতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বসে পড়ি শয্যার ওপর। একটা কিছু জবাব সিরাজকে দিতেই হবে। জবাব না শুনে সে যাবে না। মিথ্যে বলে যে বিদায় করবো, সেরকম মূর্খ সে নয়। অভিনয় করার দুরাশা ছাড়তে হলো। ধীরে ধীরে বলি, 'হীরাঝিলের বাইরে সে কখনোই যায় না। গেলে আমি জানতে পারতাম, নবাব।'

সিরাজ একটু সন্তুষ্ট হলো বলে মনে হয়। তার চোখ-মুখের উত্তেজনা যেন অনেকটা প্রশমিত। ছোট্ট একটা চৌকির ওপর তার ডান পা তুলে দিয়ে বলে, 'কোথায় তবে সে?'

'হীরাঝিলের ভেতরেই কোথাও আছে নিশ্চয়।'

'খুঁজে দেখেছি সব, নেই।'

মনে মনে বলি, সব খোঁজা হয়নি। একসময় আলিবর্দিকে যে প্রকোষ্ঠে আটকে রেখে অর্থ আদায় করা হয়েছিল, গোলকধাঁধার সেই ঘর কয়টি এখনো বাকি রয়েছে। ভালোবাসার পাত্রীকে সেই ঘরখানার রহস্য জানাতে যে তুমি বাদ রাখোনি সিরাজ।

মুখে বলি, 'তাহলে বোধহয় ফৈজী বেগম আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে মজা করে।'

'লুৎফা!'

তার চীৎকারে ক্রোধ ফুটে উঠল না। বরং অসহায় আর্তনাদ বলে মনে হলো সে চীৎকার।

'মাফ্ করবেন, নবাব। আমার হয়তো ভুল হয়েছে।'

'ভুল নয়। তুমিই লুকোচুরি খেলে মজা দেখছো। মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছো তুমি।'

স্তব্ধ হয়ে যাই।

সিরাজ বলে, 'আসলে বলো ফৈজী কোথায় তা তুমি প্রকাশ করবে না। যে কোনো কারণেই হোক্ বলতে তুমি ভয় পাচ্ছো। কিন্তু সিরাজকে কি এখনো চিনলে না? ফৈজীর ধরনধারণ অন্যরকম মনে হতো বলেই আজ আমি অসময়ে ফিরে এসেছি। যখনই তার কাছে যাই, মনে হয় সে যেন ক্লান্ত। আমার সম্মান রাখার জন্য শুধু নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো মন যুগিয়ে যায়! তাই সন্দেহ হয়েছিল। সিরাজকে সব কিছুতে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু মনের ব্যাপারে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। সে ফাঁকি শুধু তুমি দাওনি, তাই চিরকাল তুমি লুৎফাই আছো।'

'হ্যাঁ, হীরাঝিল থেকে তাড়িয়ে দেননি বটে।'

'অভিমান করার যথেষ্ট কারণ তোমার রয়েছে। কিন্তু সব কিছু লক্ষ্য করে একটা জিনিস তোমার চোখ এড়িয়ে যায় কেন, লুৎফা? নবাব সিরাজউদ্দৌলা সব জায়গায় মাথা উঁচু করে থাকলেও, তোমার কাছে যখন আসে মাথা নীচু করেই আসে।'

'বছরে একবার দু'বার এলে সেভাবেই আসেন বটে। তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ বৈকি।'

'অভিমান করো না। এটা নবাব সিরাজের দুর্ভাগ্য সে কিমা-পোলাও ছেড়ে সে শরাবের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। তাই তার এই দুর্দশা। কিমা-পোলাও নেশা ধরায় না বটে, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে সেটারই দরকার।'

'নবাব এসব জানেন দেখছি!'

'জানি লুৎফা, সবই জানি। তবু নিজেকে সামলাতে পারি না। এবার বোধহয় সামলাবার দিন এসেছে। তুমি আমার জর্জ-বিরিঞ্জু, খিচ্‌রি, সেব-বিরিঞ্জু—তুমি আমার কিমা-পোলাও, সওলা—তুমি আমার দম-পোক্ত, কালিয়া-কাবাব, দুনিয়াজা। ফৈজী শরাব—শুধু শরাব। তাকে আমি খুঁজে বার করবোই। শরাবের পাত্র একদিন চূর্ণ করেছিলাম মনে আছে? আজ আবার সেদিন ফিরে এসেছে। তোমাকে আর বলে দিতে হবে না, কোথায় রয়েছে সে। আমি বুঝতে পেরেছি। হীরাঝিল আমার নিজের তৈরি। তার অতি গোপন স্থানও আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত। সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে চায়।

'সিরাজ।' বহুদিন পরে তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখি। তার নাম ধরে ডাকি। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়ায় আমার। চেপে রাখার চেষ্টা করি না।

'কি লুৎফা?'

'তুমি জানো সে কোথায় রয়েছে?'

'জানি বৈকি, তবে এতটা আশা করিনি।'

'তাকে ক্ষমা করো, সিরাজ।'

'না।'

'তাকে দূর করে দাও হীরাঝিল থেকে—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সীমানার বাইরে।'

'তাহলে সত্যিই? কে রয়েছে তার সঙ্গে, লুৎফা?'

'সৈয়দ মহম্মদ খাঁ।'

সিরাজ শক্ত হয়ে ওঠে।

'তাকে ক্ষমা করো, সিরাজ।'

'না-না, ক্ষমা করতে পারবো না। তুমি এতদিন বলোনি কেন?'

'তুমি ব্যথা পাবে বলে।'

'আশ্চর্য! বেগম হয়ে বড় ভুল করেছো, লুৎফা। আমি যদি কৃষক হয়ে তোমাকে পেতাম, তাহলে বাংলার মসনদও চাইতাম না।'

'ক্ষমা করলে তো ফৈজীকে?'

'কথা দিতে পারি না।' সে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

হামিদা শিশুটিকে নিয়ে আড়াল থেকে বার হয়ে আসে। সে বলে, 'আমিও সব জানতাম, বেগমসায়েবা। ফৈজী বেগমের জন্যে এত করে বলা আপনার ভুল হলো।'

'ভুল হয়নি হামিদা। অনেকদিন থেকে তো নবাব-পরিবারে আছো। চিরকাল হিংসা আর প্রতিহিংসাই দেখলে। মনও তোমার সেইভাবেই তৈরি হয়েছে। একটু ক্ষমা করতে ক্ষতি কি?'

মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে হামিদা বার হয়ে যায়। হামিদার কোলেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সিরাজের কথাগুলো মনে মনে রোমন্থন করি। সেও শান্তির একটা ছোট্ট নীড় চায়। মসনদ ছেড়ে দিয়ে কৃষক হতে চায়, যদি কেউ তাকে প্রাণভরে ভালোবাসে। মসনদের চারিদিক ঘিরে অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্রের জন্যে তার কবি-মন বিষাক্ত।

আমিও একসময়ে বেগম হতে চাইতাম না। সাধারণ সৈনিকের বধূ হয়ে ছোট্ট সুখ আর ছোট্ট দুঃখে জীবন কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন দেখতাম খড়ে-ছাওয়া কুটিরের, আর একটি পুরুষের একান্ত নির্ভরশীল প্রেমের। কোথা দিয়ে কি সব হয়ে গেল। পুরুষ-হৃদয়ের ভালোবাসা পেয়েছি, কিন্তু একেবারে একান্ত কি? আর একান্ত হলেও ভালোবাসা সর্বদা আমাকে ঢেকে রাখে না, শুধু অসময়ে আমার কাছে আশ্রয় আর সান্ত্বনা চায়। তাতে আমার বুভুক্ষু মন যে ভরে না। বাকি সময়টা যে আমি কেঁদে মরি।

সিরাজও হয়তো এই রকম একটা কিছু ভাবে। কৃষক-পরিবারে জন্মালে মনকে বিক্ষুব্ধ করার মতো নানা উপকরণ এসে জুটতো না। ফৈজীর নাগাল পাওয়া যেত না। নিশ্চিন্তে আমারই মুখের দিকে চেয়ে জীবন কাটাতে পারতো। কিন্তু সিরাজ কৃষক নয়, নবাব। সে চায় নবাবীর অপরিসীম ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ফৈজীর মতো এক তীব্র নেশা। আর সবার ওপর সে প্রেমিক, তাই পদে পদে আঘাত পায়। ফৈজীর মন যে প্রেমিকার মন নয়।

সহসা চীৎকার শুনে দরজার দিকে এগিয়ে যাই। হামিদা এসে বলে, 'সর্বনাশ হয়েছে, বেগমসায়েবা।'

ফৈজীকে পাওয়া গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সৈয়দ মহম্মদ খাঁকেও?'

'জানি।'

'নবাব ক্ষেপে গিয়েছেন।'

'জানি।'

'যাবো। সৈয়দ খাঁ এখনো আছেন?'

'না, নবাব তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন।'

'কিছুই বলেননি তাঁকে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

জানতাম। ফৈজীর ওপরই নবাবের রাগ। আর রাগ নিজের অক্ষমতার ওপর। সাধারণ পুরুষের মতো সে যে সৈয়দের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে না, এ জানা কথা। সিরাজ ঘসেটি নয়।

হামিদাকে সঙ্গে নিয়ে যাই গোলকধাঁধার কাছে। সিরাজ একা দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। ভেতরে থেকে ফৈজী চীৎকার করে তাকে গালাগালি দিচ্ছে। নিজের কবর নিজে খুঁড়ছে সে। ভুলে গিয়েছে যে, সিরাজ তার প্রেম-ভিখারী হলেও সে বাংলার নবাব।

'শুনছো লুৎফা।' কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সিরাজ বলে। অদ্ভুত শান্ত তার কণ্ঠস্বর। কোনোরকম উত্তেজনা নেই। এত শান্তভাব ভালো নয়।

আমি বলি, 'ফৈজী, চুপ করো। অন্যায় করেছো, তার জন্যে ক্ষমা চাও নবাবের কাছে।'

'ও, তুমিও এসেছো? এতদিনে লুৎফা বেগমের দিকে নজর পড়েছে নবাবের? ভালো, খুব ভালো।'

'পাগলামি করো না, ফৈজী। তুমি মোহনলালের বোন। শত অপরাধ করলেও ক্ষমা পেতে পারো।'

'চুপ কর্ বাঁদী, তোর কথা শুনতে চাই না।'

আমার গা গরম হয়ে ওঠে তার কথায়। আমি যে এককালে জারিয়া ছিলাম, সেকথা মনে করিয়ে দিতে চায় ও।

এবার সিরাজ বলে, 'আর তুমি নর্তকী। সম্মানের আসনে বসিয়েছিলাম, অথচ সে সম্মান রাখলে না।'

'নর্তকীদের স্বভাবই তাই, নবাব। ভুলে যাচ্ছো কেন যে, সে কারও বন্দী নয়। আমি সেধে আসতে চাইনি। যেচে আমাকে দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছিলে। দয়া করে এসেছিলাম। নইলে তোমার মতো হাজারটা নবাবকে কিনতে পারে এমন লোকেরা আমার পা ধরে তুষ্ট করতো।'

আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'ফৈজী, চুপ করো।'

কিন্তু সে তখন উন্মাদ। ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা-শরমের আর বালাই নেই। তার ওপর সিরাজ তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে।

'না, চুপ করবো না। জারিয়ার হুকুম আমি মানি নে। আমাকে হীরাঝিলের বাইরে দিয়ে এসো, তবে চুপ করবো।'

সিরাজ বলে, 'তোমার অপরাধের ভালো রকম কৈফিয়ত না দিলে ছাড়তে পারি না। বাংলার নবাব দিল্লির বাদশার তুলনায় সামান্য হলেও এখন তুমি তারই আওতায়।'

'কিসের কৈফিয়ত? আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

'আমার মন নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলেছো।'

'নবাব ভুলে যাচ্ছো কেন, ওটা আমাদের ব্যবসা।'

'তুমি বেশ্যা।'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু নবাবের মা তো বেশ্যা ছিলেন না। তিনি কেন হোসেন কুলিখাঁর সঙ্গে....

'ফৈজী!' সিরাজ রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

'সত্যি কথা বলতে ভয় পাই নে। তাঁর কেচ্ছা শুনলে আমারও লজ্জা হয়, নবাব।'

'ফৈজী!'

'ভয় দেখাচ্ছো কাকে, নবাব? বেশ্যা কারও ঘরে বন্দী থাকে না।'

'কিন্তু তুমি বন্দী থাকবে। তোমার সুন্দর শরীরের মাংস গলে পচে যে-কঙ্কাল বার হয়ে পড়বে, সেই কঙ্কালও বন্দী থাকবে এই হীরাঝিলে। হীরাঝিলের মধ্যেই সে-কঙ্কাল একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।'

হঠাৎ দেখতে পাই, সিরাজের ইঙ্গিতে বাগিচা থেকে চার-পাঁচজন লোক ছুটে এসে ফৈজীর বন্দী-ঘরের সামনে দেওয়াল তুলে দিতে শুরু করে। ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে আসে। প্রথম থেকে সিরাজ তাহলে সব ঠিক করেই রেখেছিল। এতক্ষণ শুধু ফৈজীকে বাঁচবার সুযোগ দিচ্ছিল, আর সে হয়তো আমারই অনুরোধে।

সিরাজ যে সাংঘাতিক একটা কিছু করবে আমি জানতাম। কিন্তু সেটা যে এত অমানুষিক হবে কল্পনাও করিনি। আমি তার হাত চেপে ধরে বলি, 'নবাব, এ শাস্তি ওকে দিও না।'

'শুধু এই কথাটা তোমার আমি রাখতে পারবো না। এরপর থেকে তোমার সব কথারই মর্যাদা আমি রাখবো।'

'নবাব, ওকে ছেড়ে দাও, ও দিল্লি চলে যাক।'

'পাগল। ও ফিরে গেলে দু' মাসের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত হবে।'

'তাহলে ওকে হোসেন কুলিখাঁর মতো হত্যা করো।'

'না, ও বন্দী থাকবে হীরাঝিলে। চিরকাল.....'

'নবাব।'

'ক্ষমা করো লুৎফা, শেষবারের মতো ক্ষমা করো।'

আমি ছুটে পালিয়ে আসি সেখান থেকে। পেছনে ফৈজীর ভীত আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। সে বুঝতে পেরেছে, বার হবার পথ চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। নবাবের কাছে আকুল মিনতি জানাচ্ছে এতক্ষণ পরে। জানি, তার সব আকুতি বৃথা হবে.....সব বৃথা!

নিজের ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। এমন সময় সিরাজ এসে প্রবেশ করে। কান্নায় ভেঙে পড়ি আমি, 'কেন এই নিষ্ঠুর কাজ তুমি করলে, নবাব?'

'আমারও কম কষ্ট হচ্ছে না, লুৎফা। সে মোহনলালের বোন।'

'শুধু তাই, আর কিছু না?'

'ভালোও হয়তো বাসতাম। কিন্তু তার চেয়ে নেশাটাই বড় ছিল। তুমি নেই, একথা ভাবতে পারি না। অথচ ফৈজী নেই, বেশ ভাবতে পারছি।'

'সে হয়তো এখনো বেঁচে রয়েছে। নিশ্বাস নেবার মতো যথেষ্ট বাতাস সেখানে অনেকক্ষণ থাকবে।'

'হয়তো থাকবে।'

'ওকে মুক্ত করে দাও।'

সিরাজ নিজের হাত দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিজের চুল টেনে বলে, 'না-না, কখনোই না।'

গবাক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। গঙ্গার জল রক্তবর্ণ, আকাশও লাল চারিদিকে শুধু লাল.....ফৈজীর রক্ত। অন্যদিন হলে মুগ্ধ হতাম, আজ ভীত হলাম। সিরাজ আর আমার মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবধান আজ অপসারিত হয়েছে, অথচ আনন্দিত হতে পারছি না। সিরাজের কাজ শত নিষ্ঠুর হলেও খানিকটা চোখের জল ফেলে আমার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হতে পারলাম কই?

হীরাঝিলের বাগিচার মধ্যে দিয়ে মোহনলালের হেঁটে আসতে দেখে সিরাজকে বলি সে-কথা।

'হ্যাঁ, তাকে আসতে বলেছিলাম।'

'তাঁকে তুমি কি বলবে, নবাব?'

'সত্যি কথা সব বলবো।'

'তুমি বন্ধু হারাবে। হাজার হলেও সে ফৈজীর ভাই—একই মায়ের পেটের ভাই।'

'তবু বলতে হবে লুৎফা, উপায় নেই।'

সিরাজের সঙ্গে আমিও পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একে-একে জ্বলে উঠছে হীরাঝিলের আলো। ঝিলের জল সে আলোয় চক্‌চক্ করছে, যেন ফৈজীর জন্যে কাঁদছে। ফৈজীকে নিয়ে বজরা আর ঝিলের জলকে মাতাল করে তুলবে না। বজরাটি এককোণে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ব্যথায় মূক যেন। নূপুরবাঁধা পায়ের তালে সে আর কখনো নাচবে না।

'আমাকে ডেকেছিলেন, নবাব?' কুর্নিশ করে মোহনলাল বলে।

'হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনে ডেকেছি, মোহনলাল। তোমাকে আজ যে খবর শোনাবো, তা না বলতে পারলেই জীবনে আমি সব চাইতে খুশি হতাম।'

'বলুন।'

'কিন্তু সে তো এখানে বলা যাবে না, আমার সঙ্গে একটু ওদিকে আসবে?'

গোলকধাঁধার কাছে মোহনলালকে নিয়ে যাবে সিরাজ। তাড়াতাড়ি সবার অলক্ষ্যে আগে থেকে আমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই।

মোহনলালকে নিয়ে এসে সিরাজ বলে, 'মোহনলাল, আমাকে ক্ষমা করো।'

'সে কি নবাব!' —মোহনলালের দৃষ্টিতে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। তুমি শুধু আমার সেনাপতি নও, তুমি আমার বন্ধু। নবাব হয়ে তোমার ওপর হুকুম চালাতে পারি বটে, কিন্তু নবাবী আওতার বাইরে অনেক কিছু আছে। তোমার বোনকে আমি যখন দিল্লি থেকে নিয়ে আসতে চাই, তুমি বার বার আমাকে নিষেধ করেছিলে। তখন তোমার কথায় কান দিইনি, বরং বিরক্ত হয়েছিলাম তোমার ওপর। আজ বুঝছি, তুমি যা বলো অনেক ভেবেই বলো, যা করো আমার মঙ্গলের জন্যই করো। ক্ষমা করো আমাকে।'

'এতে ক্ষমার কি আছে, নবাব?'

'আছে। সেদিন যদি তোমার কথা শুনতাম, তাহলে আজ তোমাকে এতবড় আঘাত পেতে হতো না। তুমি আমার মঙ্গল চেয়েছিলে, অথচ আমি তোমার সর্বনাশ করলাম।' সিরাজের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

'আপনার কথা কিছুই তো বুঝতে পারছি না, নবাব।'

'বোঝবার মতো করে বলতে আমার বাধছে! হয়তো আজ আমি তোমাকে হারাবো, তবু বলতেই হবে।'

'নবাব!' মোহানলালকে এবার বিচলিত বলে মনে হলো। সিরাজের কথায় হেঁয়ালির মধ্যেও তিনি আসল সত্য কিছুটা অনুমান করেছেন বোধহয়।

'ফৈজীকে আমি হত্যা করেছি।'

মোহনলাল একটু কেঁপে ওঠেন। তাঁর হাত-পা কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'উচিত কাজ করেছেন, নবাব। ওর ব্যভিচার আপনার দেশের অমঙ্গল ডেকে আনতো।'

'সে কি মোহনলাল, তুমি মানুষ!'

'যোদ্ধাদের সহজে বিচলিত হতে নেই, নবাব। তাহলে কোন্ ভরসায় আপনি আমাকে পাঁচ-হাজারী সেনাপতি করবেন?'

নিষ্ঠুর! পুরুষ মাত্রেই নিষ্ঠুর। ওরা সব পারে। নতুন ওঠানো দেওয়ালের ওপর হাত রেখে সিরাজ বলে, 'এরই পেছনে রয়েছে ফৈজী।'

'ভালোই হয়েছে।' মোহনলাল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। অনেকক্ষণ তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে। এতক্ষণে যেন তিনি প্রথম বুঝতে পারেন, প্রকৃত কি ঘটেছে। দু'হাত দিয়ে নতুন দেওয়াল আঁকড়ে ধরে সজোরে ঠেলতে থাকেন।

'ও কি করছো, মোহনলাল?'

ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে বাংলার সবচেয়ে সাহসী সেনাপতির। তিনি বলেন, 'ছেলেবেলায় ও আমার বড় অনুগত ছিল, নবাব। মা মারা গেলে আমিই ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করি। কতদিন আবদার করে কত জিনিস চেয়েছে, দিতে পারিনি বলে আমার বুক ফেটে যেতো। দেবার মতো যখন সামর্থ্য হলো আমার, তখন তো সব কিছু খুইয়ে বসে থাকল। চিরদিন দুঃখই পেলো ও।'

'মোহনলাল, ভেঙে ফেলছি দেওয়াল। এখনো হয়তো বেঁচে আছে সে! মোহনলাল.....'

'না-না, থাক্। ওখানেই থাক্।' ছুটতে ছুটতে চলে যান তিনি হীরাঝিল থেকে।

পর্দার আড়াল থেকে বার হয়ে এসে সিরাজের হাত ধরি।

'লুৎফা, সব কিছুর মূলে আমি।'

'না, ভাগ্য।'

সিরাজ মতিঝিল আক্রমণ করলো। ঘসেটি বেগম নবাবের সাদর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তার মতো সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারিণীর পক্ষে সিরাজের মতলব বুঝতে কষ্ট হয়নি।

কিন্তু তার ভরসা নজরালি। সিরাজের বিরুদ্ধে সে বিন্দুমাত্র রুখে দাঁড়ালো না। বরং নবাবকে তুষ্ট করবার জন্যে নানা উপঢৌকন পাঠালো।

হীরাঝিলের একটি কক্ষ ঘসেটির জন্যে নির্দিষ্ট হলো। ভেবেছিলাম, রাগে আর লজ্জায় ঘসেটি হয়তো কোনো কাণ্ড করে বসবে, কিন্তু সিরাজ যখন নিজে বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে হীরাঝিলে তাকে সাদর সংবর্ধনা জানালো, তখন তার মুখে হাসি ফুটতে দেখলাম।

আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললো, 'আমার দিন এতদিনে সত্যিই ফুরলো।'

'ও কথা বলছেন কেন?'

'আর কিছু করবার নেই আমার। ভাবছি কি করে সময় কাটাবো। আমি আমিনা নই, লুৎফাও নই। বেগম মহলের হাজারটা বেগমের মতোও আমি নই। হীরাঝিলে আমার অসম্মান হবে না জানি, কিন্তু তৃপ্তি পাবো না।'

'জানি ঘসেটি বেগম। আপনি নবাব আলিবর্দির পুত্র হয়ে জন্মালে বাংলার মসনদে সিরাজ বসতো না। আলিবর্দি তাঁর পুত্রের মধ্যেই নবাবের যোগ্য গুণাবলী খুঁজে পেতেন। হারেমের সুখ আর বিলাসিতায় তুষ্ট থাকা আপনার স্বভাবে নেই। আপনি চান বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র।'

ঘসেটি অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে। লজ্জিত হয়ে বলি, 'অমন করে কি দেখছেন?'

'না, কিছু না। ভাবছি তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা আদৌ নির্ভুল ছিল না।'

হেসে বলি, 'মতিঝিল আক্রমণের ব্যাপারে আমারও পরামর্শ ছিল?'

'এখন সে-কথা বিশ্বাস করি, তবু কি ঠেকাতে পারবে? বাইরে যে আগুন জ্বলছে।'

'সে আগুন কি নিভবে না?'

'খুব কঠিন।'

'আপনার পরামর্শ যদি পাই।'

'পরামর্শে সব সময় সব কিছু হয় না, লুৎফা। সিরাজের প্রতিটি নির্ভরযোগ্য লোক এখন মসনদের স্বপ্ন দেখে, যেমন আমি দেখতাম। কার ওপর বিশ্বাস করবে?'

চুপ করে থাকি।

ঘসেটি জিজ্ঞাসা করে, 'আমিনা কোথায়?'

'উনি তো এখানে থাকেন না। তবে আজ আসবেন শুনছি।'

'ও এখানে থাকলে ঝগড়া হবে। আমিনা একেবারে মেয়েমানুষ।'

বুঝলাম, ঘসেটির দিন সত্যিই শেষ হয়েছে, যেমন আলিবর্দির বেগমের দিন শেষ হয়েছে। যাঁর পরামর্শে একদিন বাংলা বিহার উড়িষ্যার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হতো, তিনি জীবিত থাকলেও এখন তাঁর কোনো কথারই দাম নেই। তেমনি ঘসেটির গুণাবলীও এখন নিষ্প্রয়োজন। হীরাঝিলের অনেক মেয়েমানুষের মধ্যে সেও একজন।

ঘসেটির সঙ্গে আমার কথোপকথনের কথা সিরাজকে বললাম।

সে বললো, 'একটু দেরিতে বুঝল ঘসেটি। সে আমার যা ক্ষতি করেছে অন্য কেউ তা করেনি।'

'কেন নবাব?'

'সে মসনদের স্বপ্ন না দেখলে জগৎশেঠ আর রাজবল্লভ কখনো হাতছাড়া হতো না। আর তারা আমার হাতে থাকলে মীরজাফর মাথা তোলার কথা ভাবতে পারতো না।'

'ইংরেজরা রয়েছে। তারা মীরবক্‌সীকুলের সহায় হতো।'

'ইংরেজ! জগৎশেঠ না থাকলে ইংরেজ সহায় হবে?'

'তাদের রণকৌশল অনেক ভালো শুনেছি।'

'কথাটা ঠিক। তবু তারা এদেশে আগন্তুক। এই তো শওকৎজঙ যুদ্ধ করতে আসছে। কই, সহায় হোক তো ইংরেজ? সাহস আছে?'

'শওকৎজঙ যুদ্ধ করতে আসছে?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র সংবাদ পেলাম। নবাব হবার সাধ হয়েছে তার। সে সাধ ঘুচিয়ে দেবো।'

'কাকে পাঠালে তার বিরুদ্ধে?'

'মীরজাফরকে।'

'মীরজাফর!'

'চমকে উঠলে বলে মনে হলো।'

'হ্যাঁ, কথাটা অদ্ভুত শোনালো কিনা, তাই।'

সিরাজ হেসে বলে, 'কেন, মীরজাফর যুদ্ধ করতে পারে না?'

'খুব ভালো পারে। শওকৎজঙের সৈন্য হাতে পেলে আরও ভালো পারবে।'

'ভুল করলে, লুৎফা। বড় রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করতে হলে ছোটখাটো ব্যাপারে নিজেকে একটু বেশি রকম বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করতে হয়। এ যুদ্ধে মীরজাফর সবচেয়ে বেশি বীরত্ব দেখাবে। তাই আমি নিশ্চিন্ত আছি। তবে তোমার কথাটা যে একেবারে ভাবিনি তা নয়। এর জন্যে তার সৈন্যের পেছনে মোহনলাল তার পাঁচ-হাজারি নিয়ে আত্মগোপন করে থাকবে।'

'মোহনলাল এর মধ্যেই কি সামলে উঠেছেন?'

'বড় গাছের ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপটা যায়, তারা সামলেও ওঠে। বড় গাছ তো লতা নয় যে সামান্য ঝড়ে মাটিতে গড়াগাড়ি যাবে।'

'কিন্তু বড় গাছ যে কতখানি দৃঢ় হতে পারে, মোহনলালকে না দেখলে, আমি বিশ্বাস করতাম না।'

'আমাকে দেখে?' সিরাজ মৃদু হাসে।

'না।' মুখ দিয়ে ফস্‌কে বার হয় কথাটা।

'আনন্দ হলো, লুৎফা। অন্য বেগম হলে বলতো, আপনি তো সবার ওপরে নবাব। আপনি গাছ নন, পর্বত। কী তোষামোদ?'

স্বস্তি পেলাম সিরাজের জবাব শুনে।

যুদ্ধে শওকৎজঙের নবাব হওয়ার সাধ ঘুচলো। মীরজাফরের অপূর্ব রণকৌশলে তার সৈন্য দাঁড়াতে পারেনি শুনলাম। তার পক্ষে শুধু অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছে কোন্ এক শ্যামসুন্দর, কেউ চেনে না তাকে। সে নাকি জীবনে প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ সৈন্য আর সেনাপতি অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছে তার যুদ্ধ। মীরজাফরও দেখেছে। হয়তো পানাসক্ত আর ভীরু প্রভুর নির্বিকার আচরণ তার মনে প্রেরণা যুগিয়েছিল। নইলে এমন নাকি কখনো হতে পারে না। তবে তার বীরত্ব নিষ্ফলা হলো। প্রভুকে বাঁচাতে পারলো না, নিজেও বাঁচলো না।

শ্যামসুন্দরের কথা শুনে মোহনলালের কথা মনে হলো। শ্যামসুন্দর যুদ্ধ জানতো না, কিন্তু মোহনলাল যুদ্ধে পারদর্শী। সিরাজের দুর্দিন যদি তেমন আসে, তাহলে মোহনলালও এমনিভাবে লড়বে। সে থাকায় বুকে অনেক বল পাই। ফৈজী হত্যায় তাই আমি অতটা বিচলিত হয়েছিলাম। কিন্তু ভুল ভেঙেছে আমার। আদর্শকে অনুসরণ করার বেলায় এই যুবক বজ্রকঠিন। ফৈজী হত্যায় এটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, শত-সহস্র আঘাতেও আদর্শচ্যুত হবে না এই বীরপুরুষ।

ঘসেটি এসে বলে, 'রাজবল্লভ আর জগৎশেঠের মুখ ভার হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'কেন?'

'এত বড় একটা সুযোগ নষ্ট হলো।'

'কিসের সুযোগ?'

'শওকৎকে নবাব করার।'

'তারা এর পেছনে ছিল নাকি?'

'হয়তো ছিল না। তবু শওকৎ নবাব হলে তাদের কপাল খুলতো। নিজেদের ইচ্ছেমতো নবাবকে চালাতে পারতো। সিরাজ বড় শক্ত ঠাঁই। তাকে বাগে আনা অসম্ভব। আমিই পারলাম না। সিরাজ হাতছাড়া হওয়াতেই তো ওদের এত রাগ।'

'ও!' আপন মনে ভাবি ঘসেটির কথা। তার চরিত্রের বোধহয় এতদিনে সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে। নইলে এমনভাবে বলতে পারতো না সে।

'জাফরাগঞ্জের খবর জানো?' ঘসেটি হঠাৎ বলে।

'না তো।'

'সে কি! বাংলার বেগম হয়ে আসল খবরটা রাখো না, বেগমসায়েবা। সেখানে এখন যে জোর মজলিস চলেছে।

'কিসের মজলিস?'

'মীরজাফর যুদ্ধ থেকে ফিরে খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এখন ওখানে দু'বেলাই যাতায়াত করছে।'

'কারণ?'

ঘসেটির মুখে বিচিত্র হাসি খেলে যায়, 'তাও কি বলে দিতে হবে? দেশের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করতে ব্যস্ত ওরা।'

'ষড়যন্ত্র করছে?'

'সাদা কথায় অর্থ তাই দাঁড়ায় বটে।'

'নবাব জানেন?'

'সিরাজ জানে না এমন কিছুই নেই। কিন্তু এখানে সে অনেকটা অসহায়।'

'তবে কি হবে?' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘসেটির সামনে উদ্বেগ প্রকাশ করে ফেলি।

'অমন ব্যাকুল হয়ে আমাকে প্রশ্ন করা কি তোমার মানায়, বেগমসায়েবা? সিরাজকে বলো, আমি তো তোমাদের শত্রুপক্ষ। এতদিন তোমাদের বিরুদ্ধে ছিলাম বলেই না এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে আমাকে।'

'নিজের লোকের কাছে থাকা বন্দীত্ব নয়, ঘসেটি বেগম।'

'তাই নাকি? তাহলে হীরাঝিলের জারিয়াদের মতো নিজের ইচ্ছেমতো বাইরে যাবার স্বাধীনতা আমার আছে?'

'সেটা নবাবকেই জিজ্ঞেস করবেন।'

'সে কি বলবে আমি জানি। বলবে, দেশের স্বার্থের খাতিরে খানিকটা বন্দীত্ব স্বীকার করতেই হবে।'

'মথ্যে বলবে না তাহলে।'

'তা ঠিক। নিজেকে আমিও বিশ্বাস করি না। বিশেষ করে রাজবল্লভের সামনে দাঁড়িয়ে বিবেক ঠিক রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

এমন স্পষ্ট আর উলঙ্গ স্বীকৃতি আমি কল্পনাও করিনি। ঘসেটি বেগম বলেই এ সম্ভব। পুরুষালি নারী!

ঘসেটি চলে যায়। তার অপসৃয়মান দেহখানার দিকে চেয়ে থাকি। রাজবল্লভ আর নজরালির দোষ কি? অমন সুন্দর চলার ভঙ্গী বেগমমহলে কয়জনের রয়েছে? ফৈজী সুন্দরী ছিল, কিন্তু এমন লীলায়িত ছন্দ তার ছিল না। ঘসেটির যৌবন ওই দেহখানাকে ছেড়ে যেতে চায় না। তাই যতদিন পারে আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছে। হয়তো তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে অমনিই থাকবে—চিরযৌবনা নারী।

ঘসেটির কথায় আমার মন আশঙ্কায় ভরে ওঠে। শওকৎ-এর মৃত্যুতে ভেবেছিলাম বুঝি চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু তা নয়। হয়তো কোনো নবাবই কখনো মসনদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। সব বেগমই চিরকাল এমনি ভাবেই দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়। না, সব বেগম নয়। শুনেছি, নতুন নবাব অনেক ক্ষেত্রে মসনদের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো নবাবের বেগমদেরও পায়। নারীও তো আসবাব, মন বলে কিছু নেই। তাই কিছুতেই তাদের ভাবনা নেই। নবাব পরিবর্তনে কিছু এসে যায় না, হারেমে থাকতে পারলেই তারা তুষ্ট।

মেয়েটা কাঁদছে। হামিদা নিয়ে গিয়েছে। কাঁদুক, যত পারে কাঁদুক। বড় হলে কান্নার ঝুলি নিঃশেষিত হয়ে কেবল হাসিটুকুই থাকবে। ওকে আমি ইচ্ছে করে কাঁদাই। সব সময় হাসে বলে বড় ভয় হয়। এখনই এত হাসি কিসের? জীবনের কিছুই শুরু হয়নি।

মেয়েটা ছেলে না হয়ে ভালোই হয়েছে। ছেলে হলে নিশ্চয়ই নবাব হতো। আর নবাব হলে সারা জীবন অশান্তি। সিরাজের মতো অল্প বয়সেই চিন্তার রেখা পড়তো তারও কপালে। নবাব আলিবর্দির তো সবে সেদিন মৃত্যু হলো—এক বছর হয়েছে মাত্র। এর মধ্যেই সিরাজের কপালে কুঞ্চন দেখা দিয়েছে। কিশোরের কপালের সেই মসৃণতা আর নেই।

সোফিয়া এসে প্রবেশ করে। সেদিন তাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম। তারপরে আর আসেনি। ওকে দেখলে আজকাল আমি বিরক্ত হই—বিরক্ত হই মহম্মদের স্ত্রী বলে। নইলে এককালে সব জারিয়াদের মধ্যে শুধু ওর ওপরই আমার মায়া ছিল। কিন্তু মহম্মদের সঙ্গে থেকে ওর চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে। সেদিনের কথাবার্তায় সেটা বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। আজ আরও রাগ হলো ওকে দেখে। কারণ মহম্মদের সর্বশেষ কার্যকলাপের বিবরণ হামিদার মুখে শুনলাম সেদিন।

জাফরাগঞ্জে সে নাকি বড় বেশি যাতায়াত করে আজকাল! মীরজাফরের পুত্র মীরনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে সে। অনুগৃহীত মহম্মদের পক্ষে এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আমারই চেষ্টায় সিরাজ তার খোশামোদের জাল থেকে যেদিন মুক্ত হলো, তারপরই মহম্মদ ওদিকে ঢলেছে। তার মনে বড় হবার জ্বালা। কিন্তু বড় হতে হলে যে বীরত্ব, সাহস আর বুদ্ধির প্রয়োজন, সে সবের কিছুই নেই মহম্মদের মধ্যে। তাই সহজ পথ বেছে নিয়েছে—কুটিল পথ। খোশামোদে সব হয়, যদি বিবেককে বর্জন করা যায়। মহম্মদের বিবেকের বালাই নেই।

সোফিয়া কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

'জাফরাগঞ্জের কোনো নতুন খবর আছে নাকি, সোফিয়া? দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করি। ঘসেটির কাছ থেকে খবরটা পাওয়ার পর ভেতরে ভেতরে জ্বলছিলাম।

'সে কি বেগমসায়েবা? জাফরাগঞ্জের খবর আমি কি করে পাবো?'

'মহম্মদ তো সেখানে রোজই যায়।'

'হ্যাঁ যায়।' একটু সামলে নেয় যেন সে।

'মীরবক্‌সীকুল যুদ্ধে জিতে ফিরেছেন। উৎসব হচ্ছে না?'

'মীরবক্‌সীকুল নবাবেরই অধীন। তিনি জিতলে নবাবের জয়। উৎসব হীরাঝিলেই তো হওয়া উচিত।'

সোফিয়া আগের চেয়ে অনেক চতুর হয়েছে। মহম্মদ তাকে ভালোভাবেই শিক্ষা দিয়েছে সর্পিল পথে। প্রচণ্ড রাগে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। সোফিয়ার কথায় কোনো রকম অমর্যাদা প্রকাশ না পেলেও খোঁচা ছিল।

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও সোফিয়া, আমি ব্যস্ত আছি।'

সোফিয়া নড়ে না।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

'বেগমসায়েবা কি আমাকে একটা অনুমতি দেবেন?'

'কিসের অনুমতি?'

'কতদিন ঘসেটি বেগমকে দেখিনি, একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। তিনি তো এখানেই রয়েছেন।'

সোফিয়ার হীরাঝিলে আগমনের উদ্দেশ্য এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়। সে আমাকে নিতান্ত অজ্ঞ ভেবেই একথাটা বলেছে। নইলে ঘসেটির নাম সোজাসুজি উচ্চারণ করতে সাহস পেতো না। বুঝলাম, হীরাঝিলের সঙ্গে জাফরাগঞ্জের একটা নতুন যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা চলছে। ওদিকে রাজবল্লভ রয়েছে, এদিকে ঘসেটি। কিন্তু রাজবল্লভ জানে না যে, ঘসেটির তার প্রতি দুর্বলতা বিন্দুমাত্র না কমলেও সে আর আগের ঘসেটি নেই।

হাসি পায়। অজ্ঞতার মুখোশ পরে বলি, 'কিন্তু তাকে দেখলে তোমরা কাঁপতে এককালে। এখন দেখা করতে চাও কোন্ সাহসে?'

সোফিয়া বিগলিত হয়ে বলে, 'যখন কাঁপতাম তখন নবাব আলিবর্দি জীবিত ছিলেন। তাঁর কন্যার প্রতাপের মূল্য ছিল।'

'এখন নেই?'

'থাকলেও বাংলার বেগম স্বয়ং অনুমতি দিলে ভয় কি?'

'কেন দেখা করতে চাও?'

'এককালে তাঁর কত সেবা করেছি, তাই দেখতে ইচ্ছে হয়।'

'তাকে দেখতে হলে কি অনুমতির প্রয়োজন?'

'বেগমসায়েবা কি তা জানেন না?'

'না, নতুন শুনলাম।'

'নবাব বাইরের কারও সঙ্গে ঘসেটি বেগমের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করেছেন।'

'কবে থেকে নবাবের এই হুকুম বহাল হয়েছে?'

'শওকৎজঙ্ নিহত হবার পর।'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সিরাজের। ঘসেটি ঠিকই বলেছে, কোনো কিছুই সিরাজের অজানা নেই। সে সব জানে, সব বোঝে, অথচ মুখে কিছুই বলে না। এমন সংযম সত্যিই অসাধারণ। সিরাজের কপালের কুঞ্চিত রেখার কারণ এবার খুঁজে পাই। প্রতি পদে যদি এতখানি ভেবে কাজ করতে হয়, তাহলে এমন হবেই। নবাব আলিবর্দির বেগমেরও তাই অমন হয়েছিল।

নিজের মসৃণ কপালের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিই। মনে মনে দুঃখ হয় সিরাজের জন্য। আমি কিছুই ভাবি না। তার দুশ্চিন্তায় অংশগ্রহণ করে তাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করার ক্ষমতাও আমার নেই। সব বোঝা তারই ঘাড়ে।

সোফিয়াকে বলি, 'তুমি নবাবের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে বলো আমাকে?'

'সে কি বেগমসায়েবা! তা কি বলতে পারি? আপনিও যা, নবাবও তাই। আপনার আদেশে নবাবের আদেশের কড়াকড়ি কিছুটা কমাতে পারেন। বাংলার বেগমের ক্ষমতা নিশ্চয়ই রয়েছে।'

'শোনো সোফিয়া, ঘসেটির সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। নবাবের আদেশ থাকলেও আমি তোমাকে দেখা করতে দিতাম না। তুমি এখনই হীরাঝিল ছেড়ে চলে যাও। আর ককনো আসবে না এখানে।' বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে, কোনো কিছু প্রকাশ না করে, আমি সোফিয়াকে দরজা দেখিয়ে দিই।

সে আমাকে দায়সারা কুর্নিশ করে দুপ্‌দাপ্ পা ফেলে চলে যায়। তার উদ্ধত গতি দেখে মনে হয়, কোনো খোজা ডেকে গর্দান নিতে হুকুম দিই। জানি, সোফিয়াকে ফিরিয়ে দিয়ে যে তরঙ্গ তুললাম, তার গতি অনেকদূর পৌঁছবে।

সৈন্যসামন্ত নিয়ে সিরাজ নিজেই কাশিমবাজারের দিকে রওনা হলো। খুব গুরুতর কিছু না হলে সে নিজে যুদ্ধে যায় না। কারণ সে মুর্শিদাবাদে না থাকলে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে আজকাল। ইংরেজরা একটু বাড়াবাড়ি করেছে একথা সত্যি। কিন্তু নবাবের এতটা বিচলিত হবার কারণ কি?

রওনা হবার আগে বলেছিলাম, 'এবারের মীরবক্‌সীকুলকে পাঠিয়ে পেছনে মোহনলালকে রাখলে হতো না?

'না।'

'ইংরেজরা শওকৎ-এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু তাদের কৌশল সম্বন্ধে তুমিই তো একদিন বলেছিলে।'

'মীরবক্‌সীকুলের বিরাট সৈন্যের কাছে কাশিমবাজারের কয়েকজন মাত্র ইংরেজ কি করতে পারে?'

'একটু ভাবো বুঝতে পারবে।'

'আমি আর ভাবতে পারি না। তুমি মুর্শিদাবাদ ছাড়লে আমার ভয় করে।'

'ভয় আমারই কি কম? যতবার মুর্শিদাবাদ ছাড়ি ততবারই মনে হয়, এসে দেখবো মসনদে অন্য কেউ বসেছে।'

'তবে যাচ্ছো কেন?'

'ইংরেজরা নিজে যে নবাব হবে না।'

'বুঝলাম না।'

'আবার একটু ভাবো।'

''আমি সত্যিই আর কিছু ভাবতে পারি না, নবাব।'

সিরাজ আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে বলে, 'এটুকু বুঝলে না বেগমসায়েবা? শওকৎ নিজে নবাব হতে আসছিল। মীরজাফর তা হতে দেবে কেন? তার নিজেরই যে সেই সাধ। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাঠালে সে ইংরেজদের হাত করে নেবে।'

'এখন তাহলে ওদের আক্রমণ করো না। ওরা তো যুদ্ধ করছে না।'

'তার চেয়েও বেশি করেছে। ওরা আমাকে অপমান করেছে। নবাবী আইন-কানুন মানছে না একটুও।' রাগে সিরাজের মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে।

'তবু....'

সিরাজ আমার মুখ চেপে ধরে বলে, 'আর কিছু বলো না, লুৎফা। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমার অমতে কিছু করবো না। এ ব্যাপারে আর কিছু বললে নবাবী করা যাবে না।'

'কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে এরা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়?'

'এদের দাবিয়ে রাখার মতো বুদ্ধি তোমার রয়েছে, সে ভার তোমাকে দিয়ে গেলাম। তাছাড়া রইলো মোহনলাল।'

'তাকেও তো পাঠাতে পারতে।'

'এই সামান্য ব্যাপারে তাকে পাঠাতে ইচ্ছে হলো না। তাকে রেখে দিয়েছি আমার ঘোর দুর্দিনের জন্যে। কাশিমবাজারে গিয়ে তার যদি ভালো-মন্দ কিছু ঘটে যায়, তখন কে থাকবে আমার পক্ষে?'

চীৎকার করে উঠি, 'আর তোমার বুঝি ভালো-মন্দ কিছু ঘটতে পারে না?'

'তবু মোহনলাল থাকবে। ইংরেজরা রাজ্যভোগ করতে পারবে না। নেমক-হারামির দেউড়ির কেউ মসনদ কলঙ্কিত করবে না।'

'নেমক-হারামির দেউড়ি! সেটা কি নবাব?'

'জাফরাগঞ্জ। আমি চলি, লুৎফা।' আমার গালে আলগোছে চুমু খেয়ে সিরাজ বিদায় নেয়।

নেমক-হারামির দেউড়ি। কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

সিরাজ নিরাপদেই ফিরলো। সঙ্গে নিয়ে এলো দুই সায়েবকে। কাশিমবাজার কুঠির দুই মাতব্বর—ওয়াট্স্ আর চেম্বারস্। এমন অদ্ভুত নাম অনেক কষ্টে রপ্ত করেছি।

সায়েব দু'জনা নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদেই থাকবে নবাবের চোখের ওপর। বাংলার সমস্ত ইংরেজদের জামিন তারা। মন্দ বুদ্ধি বার করেনি সিরাজ। ইংরেজদের সমস্ত তৎপরতার চাবিকাঠি নবাবের হাতের মুঠোর মধ্যে। সায়েবদের মেমরাও এসেছে সঙ্গে।

মিষ্টি হাসি হেসে মেমরা নবাব-পরিবারের অনেকের সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে ফেললো। হীরাঝিলে এসে আমার সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিল তারা। আমি রাজি হইনি। ফুটফুটে সুন্দরী হলেই যে বাংলার বেগমের সঙ্গে দেখা করা সহজ হবে, এ ধারণা না থাকাই উচিত তাদের।

সিরাজ খুশি হলো। বেগমের মর্যাদা রাখতে জানি দেখে সে সেই রাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তার এমন উচ্ছ্বসিত ভাব আমি এর আগে মাত্র পাঁচ-ছয়বার দেখেছি। বুঝলাম, বেগমের মর্যাদা রাখাই এর

একমাত্র কারণ নয়। তার সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত হয়েছে। সেটা জানার ইচ্ছা থাকলেও জানতে চাইলাম না। প্রেমের মধ্যে বাস্তবতা এনে ফেললে সিরাজের উচ্ছ্বাস কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে, বড় মনমরা হয়ে পড়ে সে। নিজে যেমন অবুঝ হয়, আমাকেও তেমন অবুঝ দেখতে চায় সেই মুহূর্তে।

পরদিন আমিনা বেগমকে আমার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিত হলাম। তিনি এসে কোনোরকম ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন, 'কথাটা কি সত্যি?'

'কোন্ কথা?'

'মেমদের সঙ্গে তুমি নাকি দেখা করোনি?'

'হ্যাঁ সত্যি। কেন বলুন তো?'

'তাতে আমাকে অপনাম করা হয়েছে, এটুকু বোঝো?'

'কেমন করে?' মনে মনে বিরক্ত হই।

'নবাবের মা হয়ে আমি দেখা করতে পারলাম, অথচ তুমি ওভাবে ওদের তাড়িয়ে দিলে?'

'আপনি চটেছেন। শান্ত হোন্, দেখবেন আমি ঠিকই করেছি।'

'ঠিক করেছ?' আমিনাবিবি অহেতুক ধমন দেন।

'হ্যাঁ। নবাবকে আপনি কতদিন দেখেননি?'

'দু'মাস হবে। সিরাজ আজকাল ব্যস্ত থাকে বলে আমার সঙ্গে দেখা করার সময় পায় না।'

'আমার সঙ্গে তার রোজই দেখা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই দেশের অনেক বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ইংরেজদের কথাও উঠে। ওরা আমাদের ঠিক বন্ধু নয়, একথা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন। মেমদের হারেমে পাঠিয়ে গুপ্ত কথা জেনে নেওয়া অসম্ভব নয় ওদের পক্ষে। সেইজন্যেই দেখা করিনি।'

'ওয়াট্‌সের মেমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে জানো?'

'শুনেছি। কিন্তু কাজটা ভালো করেননি। আর সেইজন্যেই বোধহয় নবাব আপনার সঙ্গে দেখা করা ছেড়ে দিয়েছেন।'

'লুৎফা'।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'না, ঠিকই বুঝেছি। নিচু ঘরের মেয়ে বেগম হলে তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা অন্যায়।'

এই মুহূর্তে আমিনা বেগমকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারি। আমার মনের অবস্থা সেই রকমই। কিন্তু সামলে নিলাম, হাজার হলেও সিরাজের মা।

'আপনি এখন যেতে পারেন। আপনি যখন নবাবের মা, তখন ছেলেকে বলুন না কেন, আমাকে আবার জারিয়া করে দিতে।'

আমিনা বেগম একটু সময় থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বলেন, 'তবে শোনো, বেগমসায়েবা, সায়েবদের ছেড়ে দেবার জন্যে সিরাজকে রাজি করিয়েছি। এর জন্যে তার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়নি। শুধু একটা চিঠিতেই কাজ হয়েছে।'

'ভালোই করেছেন। নবাবের মাতৃভক্তি তাহলে ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এর জন্যে আপনাকে ভবিষ্যতে কাঁদতে না হয়।'

'চিঠিতে যখন সেটা সম্ভব হয়েছে, তখন তোমার বেগমত্ব ঘুচিয়ে দিতে সিরাজের সামনে একটু

দাঁড়ালেই যথেষ্ট হবে মনে রেখো।'

আমিনা বেগম ছুটে বার হয়ে যান। আমি বসে দাঁতে দাঁত ঘষি।

আমার মেয়ের ভালো একটা নাম রাখা হলো না। যখন যা মনে আসে তাই বলে ডাকি। সেও সাড়া দেয়। নাম শুনে নয়, আমার গলার স্বর শুনে সাড়া দেয়। সে জানে, তাকে ডাকার সময় আমার স্বরে বিশেষ এক টান থাকে, যা অন্য সময়ে থাকে না। অন্য সবাইকে ডাকতে হলে আজকাল একটু গুরুগম্ভীর স্বরেই ডাকতে চেষ্টা করি, কিন্তু মেয়ের বেলায় আমি 'মা'।

সে আধো আধো 'মা' ডাকতে শিখেছে। কী মিষ্টি যে লাগে সে-ডাক। এক-একসময় ইচ্ছে হয়, তাকে পুরোনো বেগম মহলে সেই গবাক্ষের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। দেখাই তার মা ছোটবেলায় কিভাবে দিন কাটিয়েছে, কিন্তু ওর কি বোঝবার বয়স হয়েছে? বড় হলে নিশ্চয়ই একদিন নিয়ে যাবো।

সেই গবাক্ষের স্বপ্ন এখনো দেখি। চোখের জলে ধুয়ে যাওয়া দেওয়ালের বিবর্ণতা এখনো অটুট আছে নিশ্চয়। নবাব আলিবর্দির সময়েও যে-দেওয়ালে রং পড়েনি, এখন পরিত্যাগ হয়ে মহলের সেই নির্জনতম স্থান কি আর কারও চোখে পড়ে? সারা মহলেই আর কখনো রং লাগানো হবে কিনা কে জানে? সিরাজের এত সাধের এই নতুন হীরাঝিলের বাগিচাও যেন আগের মতো শ্যামল নেই। এর মধ্যেই একটা রুক্ষতা এর শ্যামলতা শুষে নিয়েছে যেন।

মুহূর্তের জন্যেও যে নবাবের শান্তি নেই, যার পেছনে ষড়যন্ত্র সব সময়ে হাত বাড়িয়ে রয়েছে সামান্য অসাবধান হলে টুঁটি চেপে ধরবার জন্যে, তার বাগিচার এই দশাই তো হয়, আর তার বেগমদের হয় আমার দশা। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, আমার ভেতরেও একটু রুক্ষতা এসেছে। চেহারায় এবং মনেও—যে-মুখে জারিয়াদের হুকুম করি, সোফিয়াকে গালাগালি দিই, সে-মুখের কথা কি নবাবের কাছে প্রথম দিনের মতো মিষ্টি লাগে?

এইজন্যই বোধহয় নবাবদের হাজার বেগম—নানা বয়সের, নানা স্বভাবের। মনের অবস্থানুযায়ী নিত্য নতুন বেগমের ঘরে সময় কাটায় তারা—মনের সঙ্গে যখন যে-বেগম খাপ খায়। এইজন্যই বেগমদের বাইরের ঘটনা সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখা হয়—নিশ্চিন্ত মনে তারা শুধু নবাবদের মনোরঞ্জনই করে। এ নিয়ম একদিকে অনেক ভালো। এমন হলে আমার মনে এত তাড়াতাড়ি এ কাঠিন্য হয়তো আসতো না—প্রথম দিনের লুৎফাই থেকে যেতাম।

বাইরে নবাবের আগমনবার্তা ঘোষিত হলো। চেহেল-সেতুন থেকে সিরাজ ফিরলো। আজকাল ফিরে সে আমারই কাছে আগে আসে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরিবর্তন করে নিজেকে সাজিয়ে নিই। সম্প্রতি বুঝতে শিখেছি যে, শত ভালোবাসা থাকলেও পুরুষ মানুষ মেয়েদের সজ্জিত রূপটাই দেখতে চায়, বিশেষ করে সে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে দিনান্তে ফেরে। নিজেকে আগোছাল করে রেখে দেখেছি, মুখে কিছু না বললেও আমার ওপর সিরাজের আকর্ষণ ততটা দুর্নিবার হয়ে ওঠে না। অথচ খুব সেজেগুজে বসে থাকলে সে এসেই প্রথমে আমাকে আদর করে। সাজানো রূপ যখন অত ভালোবাসে সিরাজ, তখন সেইভাবে থাকাই ভালো। আমি যে তারই।

কিন্তু সেজেগুজে লাভ হলো না কিছু। ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে কোন কথা বললো না সে। দু'বার ঘরময় পায়চারি করে গবাক্ষের সামনে গিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। সে বড় গম্ভীর। গভীর চিন্তান্বিত সে। কথা বলে তাকে বিরক্ত না করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেয়ে না ডেকে থাকতে পারি না।

'নবাব।'

জবাব নেই।

'সিরাজ।'

হঠাৎ সে তার সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলে, 'জানো লুৎফা, এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এখনি একটা তীর কিংবা গোলা বাইরে থেকে ছুটে এসে আমাকে শেষ করে দিতে পারে।'

তাড়াতাড়ি তাকে গবাক্ষের সামনে থেকে টেনে সরিয়ে এনে বলি, 'তাহলে ওখানে তুমি দাঁড়িও না।'

'শুধু এটুকু সময়ে আমাকে রক্ষা করে কি হবে?' সিরাজের স্বরে বিমর্ষভাব।

'এসব কথা আজ বলছো কেন? আমার কি শুনতে সাধ হয়েছে?'

'না, তা নয়। বাংলার নবাবের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, সে বিষয়ে তোমাকে একটু ওয়াকিবহাল করে রাখলাম।'

'নবাবীর পথে যে ফুল বিছিয়ে থাকে না, সে-কথা আমি জানি, নবাব।'

'কিন্তু আমার নবাবীর পথে শুধু কাঁটাই বিছিয়ে দেওয়া নেই, প্রতিটি কাঁটার ডগায় মাখানো রয়েছে তীব্র বিষ।'

'সেই বিষকে ডিঙিয়ে যাবার মতো বুদ্ধিও তোমার রয়েছে।'

'শত বুদ্ধি থাকলেও মানুষ মানুষই, লুৎফা। সব সময়ে সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। কার ওপর আস্থা রাখবো?'

'তোমার মোহনলাল রয়েছে।'

'মোহনলাল একা কি করবে? তাছাড়া সে বুদ্ধিমান হলেও কূট নয়। সে সরল, সে বিশ্বাসী, সে বলিষ্ঠ। এসব নোংরা ঘাঁটা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কি সেই নোংরামি, নবাব?'

'সে-কথা আমার মুখে নাই বা শুনলে। মুর্শিদাবাদে এখনো হাওয়া বয়। সে-হাওয়া ভেসে ভেসে একসময় তোমার কানেও এসে পৌঁছবে। হীরাঝিলের লৌহদ্বার আর প্রাচীরে তা বাধা পাবে না।'

'তবু তুমিই বলো।'

'না।'

'সেই ইংরেজ দুটোর সম্বন্ধে কি?'

'না।'

'তাদের ছাড়লে কেন?'

'মায়ের অনুরোধে।'

'নিজের বিপদের আশঙ্কা জেনেও?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'দুটো ইংরেজকে আটকে রেখে যেটুকু লাভ, তার মেয়াদ ফুরিয়েছে। সাধারণ লোকে যদি আমাকে না চায়, তাহলে তাদের আটকে রেখে লাভ কি?'

'নবাব সিরাজদ্দৌলাকে জনসাধারণ চায় না?'

'এখনো হয়তো চায়, কিন্তু দু'দিন পরে আর চাইবে না। আমার পায়ের নিচের মাটি ধসে পড়ছে, লুৎফা। আমি বুঝতে পারছি, অথচ উপায় নেই।'

'আমাকে বলতেই হবে, কি হয়েছে?'

'না। শুধু শুনে রাখো, বিরাট ষড়যন্ত্র।'

'সে তো আজ প্রথম নয়।'

'এতদিন মানুষের মন ভাঙেনি, তাই আমার বুকে বল ছিল।' সে একটু থেমে বলে, 'ওসব কথা

থাক্, মায়ের দ্বিতীয় অনুরোধের কথা তোমাকে বলা হয়নি।'

'বলো।'

'তোমাকে বেগম থেকে আবার জারিয়া করে দিতে বলেছেন তিনি।'

'আজই কি আমাকে ঘর ছাড়তে হবে?'

'না।'

'আমার মেয়েটা কি জারিয়ার মেয়ে বলেই পরিচিতি হবে?'

'না।'

'আমাকে কি পুরোনো মহলে আমিনা বেগমের সেবার জন্যে রাখা হবে?'

'না।' সিরাজ হেসে আমার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে, 'বেগমসায়েবা দেখছি জারিয়া হবার জন্যে প্রস্তুত। সিরাজের জন্যে কষ্ট হবে না?'

কথা না বলে তার বুকের ওপর মাথা রাখি।

হাওয়ায় সেই নিদারুণ খবরই ভেসে এলো। সিরাজ সত্যি কথাই বলেছিল। মুর্শিদাবাদে হাওয়া এখনো বয়ে চলেছে—সাংঘাতিকভাবে বয়ে চলেছে।

হামিদার মুখে গুজবটা শুনে দু'হাত দিয়ে নিজের কান চেপে ধরেছিলাম।

'বিশ্বাস হয়, হামিদা?' যেন তার জবাবের ওপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

'না, বেগমসায়েবা। নবাবকে আমি ভালোভাবে চিনে ফেলেছি। মসনদে বসার পর কিছুদিন তিনি শুধু নবাব আলিবর্দির আদরের নাতির মনোভাব নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি প্রকৃত নবাব। তিনি এ কাজ করতে পারেন না।'

তার কথায় সত্যিই সান্ত্বনা পেলাম।

জাফরগঞ্জ দেউড়ি থেকে যার সূত্রপাত, এখন তা দেশের প্রতিজনের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সিরাজের ওপর তাদের বিশ্বাসের মূলে কঠিন আঘাত হেনেছে।

সিরাজ যখন কাশিমবাজার থেকে ফিরছিল, তখন নাকি ঘটনাটা ঘটেছে। গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে আসছিল বজরা। সেই বজরা থেকে সে দেখতে পেয়েছিল বড়নগরের ছাদের ওপর এক অপ্সরীকে। প্রথমে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, তারপর নাকি সৈন্যসামন্ত নিয়ে রানী ভবানীর প্রাসাদ অবরোধ করে।

পাগল না হলে এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি লোকই যে গুজব-পাগলা। তাই সবাই বিশ্বাস করে বসে রয়েছে নিশ্চয়।

ছাদের সুন্দরী ছিল রানী ভবানীর বিধবা মেয়ে তারা। হিন্দু সমাজে বড়নগরের রানীর আসন কত উঁচুতে সিরাজ সে-কথা ভালোভাবেই জানে। রানীর পালিত পুত্র একজন মহাপুরুষ, একথাও হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও অজানা নয়। তাঁরই মেয়ের দিকে কটাক্ষপাত যে সিরাজের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়, একথা আমার চাইতে ভালো কে বুঝবে? আর বুঝবে ঘসেটি বেগম, যে নবাবকে হাড়েহাড়ে চেনে।

সিরাজ এলে বলি, বাইরের বাতাস হীরাঝিলেও ঢুকেছে নবাব।'

'জানতাম।'

'বিশ্বাস করি কিনা জিজ্ঞাসা করলে না?'

'আমি মূর্খ নই।'

'দেশের সবাই সত্যি বলে ভেবেছে।'

'তাদের পক্ষে সেটাই সম্ভব।'

'আমার পক্ষে?'

'তোমাকে বজরায় করে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারি যে, বড়নগরের রাজবাড়ি গঙ্গা থেকে দেখাই যায় না। তাতে তুমি বিশ্বাস করবে। কিন্তু দেশের প্রতিটি লোককে তো সেভাবে দেখানো সম্ভব নয়।'

'কে রটালো এসব?'

'তা বলতে পারি না। তবে নেমক-হারামির দেউড়ি থেকেই রটেছে কথাটা।

'আমি জানি কে রটিয়েছে।' দরজায় ঘসেটি বেগমের কণ্ঠস্বরে আমরা উভয়েই চমকে উঠি। খবর না পাঠিয়ে এমন অকস্মাৎ সে কখনো আসে না।' সেরকম হুকুমও নেই। বুঝলাম, সব শুনে সে আর স্থির থাকতে পারেনি।

ঘসেটির কথায় সিরাজ উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে, 'কে রটিয়েছে?'

'এত বুদ্ধি থাকতেও সহজ জিনিসটা বোঝোনি নবাব। সমস্ত হিন্দুকে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হলে হিন্দুদের নাড়ির খবর জানা দরকার। মুসলমানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। রাজবল্লভ শেষ চাল চেলেছে, আর সেই চালে বাজীমাৎ। পারলে না তুমি সিরাজ, হেরে গেলে। বাইরের লোক এখন তোমাকে পশু বলে জেনে নিয়েছে।'

ঘসেটির কথায় বিদ্রূপ ছিল কিনা জানি না, কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকতে না পেরে আমার চুলের বিনুনিটা নিজের বাঁ হাতের ওপর সজোরে আঘাত করে বলি, 'আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, তাই না ঘসেটি বেগম? সে-আনন্দ চাপতে না পেরে বিনা হুকুমে ছুটতে ছুটতে এসে এ ঘরে ঢুকেছেন।

ঘসেটির মুখ সাদা হয়ে যায়, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। গম্ভীর স্বরে সে বলে, 'তোমার বাঁ হাতকে আমার মুখ বলে ভুল করে লাভ নেই, বেগমসায়েবা। দেখছো না, তুলতুলে মাংস কেমন ফুলে উঠেছে?' সে সিরাজের দিকে চেয়ে বলে, 'তোমারও কি একই ধারণা, সিরাজ?'

'না। লুৎফা এখনো ছেলেমানুষ, ঘসেটি বেগম।'

'ছেলেমানুষের মতো থাকাই উচিত তবে।'

ঘসেটির কথায় বিনুনির চাবুকের জ্বালা প্রথম অনুভব করলাম। কিন্তু কিছুই করার ছিল না বলে ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম।

ঘসেটি বলে, 'রাজবল্লভকে একবার আমার কাছে ডেকে আনতে পারো, সিরাজ?'

'কেন, কি হবে?'

'কি হবে এখনো বুঝছো না?' ঘসেটির চোখ জ্বলতে থাকে—পুরোনো মহলের সেই বিজন কোণে হোসেন কুলিখাঁ চলে গেলে আমাকে দেখে যেমন জ্বলে উঠেছিল। সেদিনের মতো আজও আমার বুক কেঁপে উঠল, যদিও আজ আর আমি জারিয়া নই, আমি বেগম লুৎফাউন্নেসা।

'স্পষ্ট করে বলো'। সিরাজ বলে।

'আলিবর্দির মসনদ আরব দেশের ওই কাপুরুষটিকে দিতে পারি না।' ঘসেটির কণ্ঠস্বরে শ্লেষ।

'যদি সেরকম দিন আসে তুমি কি করবে?'

'প্রতিহিংসা! আমাকে তুমি বন্দী করে রেখেছো, কিন্তু প্রতিহিংসা নিতে দেবে তো?'

'রাজবল্লভের সামনে গেলে তুমি বড় দুর্বল হয়ে পড়।'

'হ্যাঁ, তাই তো তাকে এই হীরাঝিলে আমার সামনে এনে দিতে বলছি।'

'কি করবে তাকে নিয়ে?' সিরাজের চোখে সপ্রশ্ন কৌতূহল।

'তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। নিজে পাগল হবো, তাকে পাগল করবো। তারপর তার মুখে একপাত্র বিষ ঢেলে দেবো।' কাঁপতে থাকে পুরুষালি নারী।

'তাতে বাংলার মসনদ সুরক্ষিত হবে না, শুধু প্রতিহিংসাই নেওয়া হবে। রাজবল্লভের মৃত্যু হলে আমার পশুত্ব সত্যি বলে প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'সেটা প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষায় নেই সিরাজ। রাস্তা দিয়ে যখন যাবে, প্রজাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখো তো, সে মুখে কি লেখা রয়েছে। রাজবল্লভের মৃত্যু না হলেও তোমার মসনদ আর কখনো সুরক্ষিত হবে না। সময় নেই সিরাজ, প্রস্তুত হও। বিশ্বাসী লোকদের একজোট করে সৈন্য ভাগ করে দাও।' ঘসেটি যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমনি চলে গেল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সিরাজ মুখ খোলে, 'ঘসেটি বেগম যদি মসনদে বসতো, তাহলে এত তাড়াতাড়ি বাংলার বিপদ আসতো না।'

'কেন নবাব?'

'সে আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে।'

'সে কিন্তু বলে, তুমিই বেশি বুদ্ধিমান।'

'সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু ঘসেটি যা বলে গেল তা সম্ভব নয়। মীরজাফরের সৈন্য অপরের মধ্যে ভাগ করে দেবার সাহস আমার নেই।'

'তুমি না নবাব?'

'হুঁ, আইনত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারেই বাধা আছে। তার সৈন্যরা আমার চেয়ে তারই বেশি অনুগত। আমার সঙ্গে তাদের আর কতটুকু সংযোগ? ঘসেটির কথামতো কাজ করতে গেলে অনর্থক একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে, যা আমি আপাতত চাই না।' চিন্তান্বিত হয়ে সিরাজ চলে যায়।

মেয়েটাকে নিয়ে হামিদা প্রবেশ করে। আমাকে অনেকক্ষণ না দেকে সে কাঁদছিল। কাঁদুক, যত পারে কাঁদুক।

মোহনলালকে ব্যস্তভাবে হীরাঝিলের বাগিচা অতিক্রম করে আসতে দেখে কেন যেন অমঙ্গলের আভাস পেলাম। এই লোকটাকে সিরাজের নবাবী-শাসনের স্তম্ভ বলে আমি মনে করি। স্তম্ভে সম্ভবত নাড়া লেগেছে। সম্ভবতই বা বলি কেন, নিশ্চয়ই তাই। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে বিচলিতভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সামান্যে বিচলিত হবার মতো পুরুষ মোহনলাল নন। নিজের বোন ফৈজীর সম্মুখে তুলে দেওয়া দেওয়ালের সামনে তাঁকে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি বলেই একথা এমনভাবে আমি বলতে পারছি।

একবার মনে হলো, নিজেই ছুটে যাই তাঁর কাছে। জিজ্ঞাসা করি, তাঁর বিচলিত হবার কারণ কি। কিন্তু আমি যে বেগম, আমি তা পারি না।

সিরাজ আমার অনুরোধে চেহেল-সেতুনে আর যায় না। হীরাঝিলেই দরবার বসে। তবে এ ব্যাপারে তাকে সম্মত করতে যথেষ্ট বেগ হতে হয়েছে। প্রথমে সে হেসে উঠেছিল এই অবাস্তব অনুরোধে। দুর্গের মধ্যে বসে থেকে রাজ্যশাসনের পরামর্শ দেওয়া অবাস্তব তো বটেই। প্রজাদের সঙ্গে সংযোগ না রেখে নবাবী করা যায় না। কিন্তু যখন তাকে বুঝিয়েছিলাম যে, জাফরগঞ্জ থেকে রটনা করা বড়নগরের ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে কিছুদিন অন্তত তার বাইরে না যাওয়াই উচিত, তখন সে বুঝেছিল। তবু একটু প্রতিবাদ না করে ছাড়েনি। বলেছিল, এভাবে হীরাঝিলের মধ্যে বসে থাকলে প্রজারা গুজবটিকে বিশ্বাস করে নেবে। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তাই বলেছিলাম, সে-বিশ্বাস

ভেঙে দেবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এই উত্তেজনাময় মুহূর্তে বাইরে গেলে কোনো প্রজা মরিয়া হয়ে কিছু করে বসলে আর কোনো উপায়ই থাকবে না।

আমার কথার সম্মান রেখেছিল সিরাজ।

মোহনলালকে আসতে দেখে ভাবলাম, নবাব ইতিমধ্যে বাইরে চলে যায়নি তো? আমাকে না জানিয়ে গোপনে হয়তো মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনে গিয়েছে প্রজাদের মন জানতে। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মনে হয়, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না, এখনই বুঝি পড়ে যাবো। মোহনলাল চরম দুর্ঘটনার খবর নিয়েই যেন ছুটতে ছুটতে আসছেন। বিশ্বাসঘাতকেরা তৎপর হয়ে উঠেছে বলেই বন্ধুপত্নীকে রক্ষা করতে আসছেন তিনি।

মেঝের ওপর বসে পড়ি। হামিদা ছুটে এসে হাত ধরে টেনে তুলে বলে, 'কি হয়েছে, বেগমসায়েবা?'

'নবাব বোধহয় আর বেঁচে নেই, হামিদা।'

'সে কি! এইমাত্র এ-ধার দিয়ে গেলেন তো।'

'নিজের চোখে দেখেছিস্? ভুল দেখিস্নি?'

'না-না, ওই দেখুন।'

হামিদার আঙুল বরাবর চেয়ে দেখি, সত্যিই সিরাজ এগিয়ে গিয়ে মোহনলালের সঙ্গে কথা বলছে। শরীরে আবার রক্ত চলাচল শুর হলো।

দু'জনাই খুব নিশ্চিন্ত হলেও স্বস্তি অনুভব করতে পারলাম না। মোহনলাল কি বললো শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

সিরাজ গিয়েছে, মোহনলাল গিয়েছে—সবাই গিয়েছে। পলাশীর প্রান্তরে জমায়েত হয়েছে সবাই ইংরেজদের বিতাড়িত করতে। এখানে এখন আছে শুধু রাজবল্লভ, জগৎশেঠ—রয়েছে উমিচাঁদ, আর রয়েছে মীরজাফরের আদরের ছেলে মীরণ, যাকে সোফিয়ার স্বামী মহম্মদ ছায়ার মতো সব সময় অনুসরণ করছে। মীরণের ছায়া মহম্মদ, ভালোই হয়েছে।

এসব কথা হামিদা বলেছে আমাকে। আর হামিদাকে বলছে সোফিয়া নিজে। তার নাকি বরাত খুলেছে। এখন সে পায়ে হেঁটে কোথাও যায় না, গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ায়। গাড়িতে করে এসেছিল সেদিন হীরাঝিলে। ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে চেঁচামেচি করে এক দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। খোজারা ছুটে এসে আমাকে জানাতে আমি হামিদাকে পাঠিয়েছিলাম।

হামিদা যেতেই সে চীৎকার করে বলেছিল, 'এই যে বিশ্বস্ত জারিয়া, বেগমসায়েবার কাছে নিয়ে চলো। এরা আমাকে যেতে দিচ্ছে না। চেনে না কিনা।'

হামিদা মাঝে মাঝে বড় বেয়াড়া কথা বলে। সোফিয়া অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে দেখে সে খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারেনি, যদিও আমি বার বার করে বলে দিয়েছিলাম যে, শান্তভাবে বুঝিয়ে যেন তাকে বিদায় করা হয়।

হামিদা বলেছিল, 'এত বড় গাড়ি করে এসেছো, ঢুকতে দেওয়া ওদের উচিত ছিল। বেগম বলে ভাবাও স্বাভাবিক। কিন্তু চেনে বলেই ঢুকতে দিচ্ছে না।'

'চেনে কি রকম?' সোফিয়া রেগে উঠেছিল।

'তুমিই ওদের জিজ্ঞাসা করো, সোফিয়া।'

'বোরখার মধ্যে থেকে কি মুখ দেখা যাচ্ছে আমার?'

'আমারও তো মুখ বোরখায় ঢাকা, তাই বলে কি আমাকে চেনে না এরা? সব চেনে। এদের যে চিনতে হয়। নইলে পাহারা-দেওয়া চাকরি থাকবে না।'

সোফিয়া বলেছিল, 'তুমি হীরাঝিলে থাকো, ওরা তোমার স্বর চেনে, চলনও চেনে।'

'তুমি পুরোনো মহলে থাকতে, তোমারও গলার স্বর ওদের চেনা। তবে তোমার চলন বদলেছে।'

'সব বাজে কথা।'

'বাজে কথা নয়, দেখবে?' হামিদা দ্বারের একজনকে বলেছিল, 'তোমরা এই বোরখার বিবিকে চেনো না?'

'হ্যাঁ. ভালোভাবেই চিনি। সোফিয়া জারিয়া।' একজন দ্বাররক্ষী নির্বিকারভাবে বলেছিল।

'দেখলে তো জারিয়া, এরা বড়ই সাংঘাতিক।' হামিদা হেসে উঠেছিল।

সোফিয়া রেগে বোরখা খুলে অগ্নিদৃষ্টিতে দ্বাররক্ষীর দিকে চেয়ে বলেছিল, 'এখন আমি কে জানো?'

'হ্যাঁ জানি। মহম্মদের সঙ্গে শাদি হয়েছে। মহম্মদ যে আমার দোস্ত ছিল বিবি। তবে এলেম্ আছে তার, বেশ ওপরে উঠে গেল।'

সোফিয়া চোখ-মুখ লাল করে বলেছিল, 'সব তোমার শেখানো, হামিদা। আজ চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু পরে যখন আসবো, তখন আর কেউ বাধা দিতে সাহস পাবে না। কুর্নিশ করে পথ ছেড়ে দিতে হবে।'

'তাই নাকি! মহম্মদ কি নবাব হবে?' হামিদা রীতিমতো হিংস্র হয়ে উঠেছিল।

'তা হবে কেন?'

'তবে কি মীরণ তোমাকে বেগম করতে চেয়েছে?' হামিদা হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

'যতই হাসো, তোমাদের দিন ফুরিয়েছে।'

'পলাশীর খবর কি তোমার কাছে এসে গিয়েছে?'

'খবর আগে থেকেই জানা আছে।'

'তাই নাকি!' হামিদা বিস্মিত হবার ভান করেছিল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পলাশীতে যুদ্ধ হবে না, মস্করা হবে।'

'তাহলে তো গেলে হতো, মজা দেখতাম।'

সোফিয়া চলে গেলে হামিদা এসে আমাকে সবিস্তারে সব জানায়। সোফিয়ার একটা কথাই আমার কানে বার বার বাজতে থাকে—পলাশীতে যুদ্ধ হবে না, মস্করা হবে। কেন সে ওকথা বললো? তবে কি জাফরাগঞ্জের চক্রান্তের খবর সে কিছু রাখে? এর মধ্যে কি কোনো সত্যতা রয়েছে?

সিরাজও ওই রকম একটা কিছু বলেছিল। বলেছিল যে, মাত্র কয়েক শ' ইংরেজ সৈন্যের কাছে যুদ্ধ বলে কিছুই হবে না। বিশাল ফৌজ নিয়ে গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালেই নাকি ওদের কর্তা ক্লাইভ সায়েব এসে পা চেপে ধরবে।

কিন্তু কই, এখনো তো কোনো খবর এলো না। মুর্শিদাবাদ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে পলাশীর প্রান্তর হতে খবর আসতে এত দেরি হবে কেন? আমি তো সিরাজকে বার বার করে বলে দিয়েছিলাম যে, প্রতিদিনের খবর জানিয়ে সে যেন একজন করে অশ্বারোহী পাঠায় আমার কাছে। অশ্বারোহীর পক্ষে সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ আসতে একদিনের বেশি দেরি হতে পারে না। অথচ এ পর্যন্ত কেউ এলো না।

'বেগমসায়েবা এত মন-মরা কেন?' মেয়ে কোলে নিয়ে হামিদা দাঁড়ায়।

'পলাশীর কোনো খবর এলো না, হামিদা?'

'সে খবর নবাব নিজে এসেই দেবেন। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে, শুধু শুধু অশ্বারোহী পাঠানো

প্রয়োজন বোধ করেন না তিনি।'

'তুচ্ছ হলেও সেটুকু জানানো উচিত ছিল। তাহলে নিশ্চিন্ত হতাম।' হামিদা কিছু বলার আগে আর একজন জারিয়া এসে কুর্নিশ করে।

'কি চাও?'

'ঘসেটি বেগম একবার এখানে আসতে চান।'

'আসতে বলো।'

ঘসেটি এলে তার দিকে চেয়ে থাকি অনেকক্ষণ। তার মুখের দিকে নয়, পরিচ্ছদের দিকে। খুব সাধারণ ঘরের মেয়েরাও বোধহয় এর চেয়ে দামী পোশাক পরে। পাশে হামিদার পোশাকের দিকে চেয়ে আমার নিজেরই লজ্জা হলো। শেষে রাগ হলো। এটাও ঘসেটি বেগমের চাল? সে কি প্রমাণ করতে চায় যে নবাব তাকে বন্দী করে রাখায় তার এ দুর্দশা হয়েছে। তার শরীরের কোথাও অলঙ্কার বা মণিমুক্তোর ছিটেফোঁটাও দেখলাম না। শুধু অলঙ্কারের শূন্য জায়গায় শরীরের ত্বকের ওপর সাদা সাদা দাগ উৎকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

'ঘসেটি বেগমের এ বেশের অর্থ?'

'রাগ করো না, লুৎফা, সাধারণভাবে থাকা অভ্যাস করছি।' তার মুখে ম্লান হাসি খেলে যায়।

'কেন, নিজের ভবিষ্যৎ কি এর মধ্যেই দেখে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ।' দৃঢ় জবাব।

'আর তার মূলে নবাব সিরাজদ্দৌলা নিশ্চয়ই?'

'না-না, ও ভুল করো না লুৎফা, ও ভুল করো না। যদি পারতাম প্রায়শ্চিত্ত করতাম। চিরদিন সিরাজের শত্রুতা করে আজ আমার অনুতাপ হচ্ছে। প্রথম থেকে তার পাশে দাঁড়ালে বোধহয় বাংলার এ দুর্দশা হতো না। সিরাজ আরও শক্তিশালী হতে পারতো।'

'আপনি এসব কি বলছেন?'

'প্রস্তুত হও লুৎফা, ভীষণ দুর্দিনের জন্যে প্রস্তুত হও।'

'আপনি কি পাগল হলেন? সিরাজ বলেছে, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বলতে কিছুই হবে না। নবাব সৈন্যের সংখ্যা দেখেই তারা আত্মসমর্পণ করবে।'

ঘসেটি কিছু বলে না। সে দৃঢ়ভাবে ঠোঁট দুটো পরস্পর চেপে ধরে। ঠিক আলিবর্দির বেগমের মতো দেখায় তার মুখ। কপালেও তেমনি রেখা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি সিরাজের চিন্তায়ও এ রেখা ফুটেছে। ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায়। নবাব আলিবর্দিকেও এমনি অবস্থায় কতবার দেখেছি। হাত দুটো পেছনদিকে, একটার ওপর আর একটা পড়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে ঘুরে সে সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপরই হামিদার কোলে আমার মেয়ের কাছে যায়। তার মাথাটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। জীবনে এই প্রথম তার মুখে একটা মাতৃত্বভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু মেয়েটা কাঁদতে শুরু করে। তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে অল্প হেসে ঘসেটি আবার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার মুখের দিকে বহুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। একসময় দেখি তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, তার দুটো চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে।

তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি আমি।

'কেঁদো না, লুৎফা। কাঁদার দিন গিয়েছে। কাঁদার দিন পরেও আসতে পারে। কিন্তু এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে। তুমি বাংলার বেগম। বাংলার নবাবের মনোবল ফিরিয়ে আনতে শুধু তুমিই পারবে। যদি সে সুযোগ আসে—'ঘসেটি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, আমি যেমন করে আমার মেয়ের মাথাই দিই।

হামিদা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবারে সে ধীরে ধীরে বলে, 'তবে কি সোফিয়ার কথাই

ঠিক? সে বলেছিল, পলাশীর যুদ্ধের খবর আগে থেকেই জানা আছে।'

ঘসেটি বেগম বলে, 'সোফিয়া ঠিক কথাই বলেছে। আজ সকাল থেকে হীরাঝিলের সামনে গঙ্গার বুকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ আর মীরণের বজরার ঘন ঘন আবির্ভাবে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।'

'তারা ওভাবে আসছে কেন?' আমি বলে উঠি।

'হয়তো সিরাজের খোঁজে। একা সিরাজ কখন ফিরে আসে তাই দেখতে। কিংবা হয়তো হীরাঝিলকে দরবার বানালে কেমন হবে, এখন থেকেই তার ছক্ কাটছে।'

'পলাশীর যুদ্ধে কি তবে সত্যিই সিরাজের পরাজয় হবে?' মাথাটা আমার সহসা ফাঁকা হয়ে যায়, যেন স্বপ্ন দেখছি।

'পলাশীতে তো যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধের নামে হবে বিরাট পরিহাস। এতক্ষণে হয়তো হয়েও গিয়েছে। সিরাজ জানতো বোধহয়।'

'তবে কেন গেল সে? কেন গেল?'

'মোহনলালের ভরসায়।'

'সে ভরসা কি আর নেই?'

'বোধহয় নেই। তাহলে সে এর মধ্যে আসতো। মীরজাফর নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত নির্লজ্জের মতো মোহনলালের বিরুদ্ধে তার সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এ সমস্তই আমার অনুমান।'

'আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। সব কিছু চিন্তার ক্ষমতা লোপ পায়।

ঘসেটি আমার চিবুক উঁচু করে ধরে আমার গালে চুমু খেয়ে বলে, 'বাংলার বেগমসায়েবা, তুমি শুধু হারেমের পুতুল নও, তুমি নবাবের সুখ-দুঃখের অংশের ভাগীদার। তৈরি থেকো। তোমার সাধের হীরাঝিল ত্যাগের জন্যেও মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করো।'

'আপনি তো আমার সঙ্গেই থাকবেন?'

'না, আমি দেখতে চাই, আমাকে নিয়ে ওরা কি করে?'

'যদি ওরা রাজবল্লভের হাতে তুলে দেয়?'

'আমি তো তাই চাই। রাজবল্লভের মরা-মুখ আমাকে দেখতেই হবে। কিন্তু তা কি কবে আর হবে? সে চতুর লোক। আমার ধারে-কাছেও আর ঘেঁষবে না বোধহয়।'

'কিন্তু নবাব কি সত্যিই পরাজিত?'

'আমার কথা যেন মিথ্যে হয়। যদি কেউ বলে যে আমি প্রাণ বিসর্জন দিলে এ সমস্ত মিথ্যে হবে, আমি তাতেও রাজি।'

'সিরাজের কি হবে?'

'পরাজিত নবাবের যা-যা হয় তারই একটা হবে। শোনো লুৎফা, যদি তোমাকে একলা কিংবা কারও সঙ্গে হীরাঝিল ছেড়ে পালাতে হয়, তাহলে কখনো জলপথে যেও না।'

'কেন?'

'জলপথে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। নদীর ধারে ধারে সৈন্যদের ঘাঁটি আছে। তাছাড়া নদীতেই যত ব্যবসা, যত কিছু। স্থলপথে গেলে নিজেকে লুকিয়ে রাখার সুবিধে অনেক বেশি।'

সেইদিনই গভীর রাতে সিরাজ এলো। চোরের মতো চুপিচুপি এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। তার চোখ-মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, কপাল কেটে রক্ত বার হচ্ছে। পোশাক ছিন্নভিন্ন, ধূলিমলিন, নগ্নমস্তক।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিরাজ যেন কত সঙ্কুচিত, 'তোমাকে বিরক্ত করলাম, লুৎফা?'

'সে কি কথা?' ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিতে যাই।

সে আমার হাত চেপে ধরে, 'না-না, ও কি করছো?'
'এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে?'
'হ্যাঁ, নইলে ওরা যে দেখে ফেলবে।'
'কারা?'
'মীরজাফরের চর। সব জায়গায় আছে ওরা।'
'তবে কি ঘসেটি বেগমের কথাই সত্যি হলো?'
'ঘসেটি! সে কখনও বাজে কথা বলে না।'
'কি হবে, নবাব?'
সিরাজ আমার মুখ চেপে ধরে, 'চুপ, আমি নবাব হই। আমি, আমি.....'
'তুমি আমার নবাব।'
'এখনো একথা বলছো?'
'চিরকাল বলবো।'
'আমি আসায় তবে বিরক্ত হওনি?'
এবারে কেঁদে ফেলি, 'ওকথা কি করে বলছো তুমি?'
'ওরা বিরক্ত হলো কিনা, তাই বলছিলাম।'
'ওরা কারা?'
'অন্য বেগমরা। পুরোনো মহলেই আগে গিয়েছিলাম। আমার বেগমরা আজকের চেহারা দেখে হেসেই অস্থির। তাড়িয়ে দিলো। বললো, এতদিনে মনে পড়েছে। দূর হও। আর-একজন কে যেন চুপি চুপি ডেকে গঙ্গা পার করে দিলো। তাই তোমার কাছে এলাম।'
'ওরা নিষ্ঠুর, ওরা পাষাণ।'
'না লুৎফা, ওরাও তো মানুষ। আমি সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।'
'তবু মানুষ হলে তোমার এ দুর্দিনে এভাবে উপহাস করতে পারতো না।'
'না-না, তারা ঠিকই করেছে।'
'থাক্ ওসব কথা, এখন ঠাণ্ডা হও। একটু ঘুমিয়ে নাও।'
'ঘুমিয়ে নেবো!' সিরাজ চমকে ওঠে। তারপরই পাগলের মতো হেসে ওঠে।
'কেন, তুমি কি করতে চাও?'
'পালাবো, পালাতে চাই।'
'কোথায়?'
'তা তো জানি না। তাই তো তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এলাম।'
এবারে আমার হাসির পালা। সত্যিই হাসি।
'তুমিও শেষে হাসলে, লুৎফা?'
'হাসির কথা বললে সবাই হাসে নবাব।'
'আবার নবাব?'
'হ্যাঁ, নবাব, নবাব, নবাব.....আমার নবাব।'
'কেন হাসলে?'
'তোমার শেষ দেখা করার কথা শুনে।'
'তুমি ঠিক বুঝছো না ব্যাপারটা।'
'সব বুঝেছি। তবু বলছি, শেষ দেখা অত সহজে হয় না।'
'তোমার কথায় হেঁয়ালি।'

'সব বলছি। একটু বসো।'

'বসবার সময় নেই।'

'বেশ, তবে একটু দাঁড়াও। হামিদাকে ডেকে আনি।'

'না-না, ডেকো না ওকে।'

'কেন?'

'ও হয়তো মীরজাফরের চর।'

'না নবাব, হামিদা আমার অনুগত। একটু দাঁড়াও।'

'কিন্তু ও যে আমাকে এ অবস্থায় দেখবে?'

'দেখুক, ক্ষতি কি? তোমার শত্রু নয় ও, বেগমও নয়। দেখে ও হাসবে না, কাঁদবে।'

হামিদা এসে সিরাজকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে কদমকেশী করে। মেয়েটাকে তার কোলে তুলে দিয়ে বলি, 'নিজের মেয়ে ভেবে মানুষ করো হামিদা। যদি ভাগ্যবলে কোনোদিন তোমার দেখা পাই, তাহলে তোমার কাছ থেকে একে চেয়ে নেবো আবার।'

'এসব কি হচ্ছে!' সিরাজের মুখে বিস্ময়।

তার কথায় জবাব না দিয়ে সামান্য কিছু জিনিস কাঁধের ওপর ফেলে নিয়ে বলি, 'চলো।'

'কোথায়?'

'সে তুমি জানো।'

'আমি কোথায় যাবো তা তো জানি না, লুৎফা।'

'আমিও কি জানতে চাইছি? আমি বলছি, তুমি যেখানেই যাবে আমি সঙ্গে যাবো।'

'লুৎফা!' সিরাজ শিশুর মতো কেঁদে ওঠে।

তার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরি, 'ভোর হতে আর দেরি নেই, নবাব।'

'চলো। মেয়েটাকে কি করবে?'

'হামিদা আমাদের সঙ্গে হীরাঝিলের বাইরে পর্যন্ত যাবে। তারপর সে নিজের পথে চলবে। আর আমি চলবো তোমার পথে।'

'আমার পথ তো সহজ নয়, লুৎফা। তুমি কি পারবে? তার চেয়ে হামিদার সঙ্গে চলে যাও মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অনেক দূরে কোনো গাঁয়ে।'

'না, আমি বাংলার বেগম। বেগম কি কখনো নবাবের সঙ্গ ছাড়ে? বেগমরা যেমন সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে, প্রয়োজন হলে তেমনি দুঃখও সহ্য করতে জানে।'

হীরাঝিলের বাইরে আসি সবাই মিলে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে বেশিদূর অবধি হামিদাকে দেখতে পেলাম না। তবু যতক্ষণ দেখা গেল চেয়ে থাকলাম একভাবে, তার কাঁধের ওপর ঘুমন্ত পদ্মফুলের দিকে—বোঁটা ছিঁড়ে নেওয়া পদ্মফুল। অনেক কাঁদিয়েছি মেয়েটাকে, তবু কি কান্নার শেষ হয়েছে? হীরাঝিল থেকে মাটির ঘরে গিয়ে তার হাসি-কান্না দুই-ই হয়তো থেমে যাবে।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন নবাব, যাবে না?' চোখের জল মুছে ফেলে বলি।

'হ্যাঁ যাবো, চলো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিরাজ ধীরে ধীরে গঙ্গার পার ধরে চলতে থাকে। আমি অনুসরণ করি তাকে।

'দেখছো লুৎফা, গঙ্গা ভাঙতে ভাঙতে হীরাঝিলের দিকে কিরকম এগিয়ে আসছে? গ্রাস করবে শীগগিরই।'

'সেই ভালো। তাই হোক নবাব।'

হঠাৎ ঘসেটি বেগমের কথা মনে পড়ল। সে নদীপথে যেতে মানা করেছিল। সিরাজকে প্রশ্ন করি, 'আমরা কি ঘোড়ায় চড়ে যাবো?'

'না, বজরায়.....মানে নৌকায়। অন্ধকারে যে লোকটা আমাকে গঙ্গা পার করে দিলো, সেই ঠিক করে দেবে বলেছে। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের সাধারণ পোশাকও সে যোগাড় করে এনে দেবে। অথচ মজা কি জানো, তাকে আমি চিনি না। মুর্শিদাবাদে আমার হিতৈষী এখনো কিছু কিছু আছে, লুৎফা।'

'অনেকেই আছে নবাব। যারা তোমার প্রকৃত পরিচয় জানে, অথচ শয়তানদের জন্যে তাদের কিছু করার উপায় নেই, তাদের অধীনে যে কোনো ফৌজ নেই। কিন্তু তোমার তো নদীপথে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'ধরা পড়তে পারি। ঘসেটি বেগম বলেছিল।'

'স্থলপথে যাবার কোনো আয়োজন তো করিনি।'

'তবু হেঁটেই যাবো।'

'আমার যে আর শক্তি নেই, লুৎফা।'

'কিন্তু এতে যে ধরা পড়তেই হবে। একটা নদীর দিকে নজর রাখা কত সহজ ওদের পক্ষে।'

'এখন সে-কথা বুঝছি! সুযোগ পেলে ঘসেটিকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, আর যদি কখনো সেদিন আসে, বাংলার মসনদে তাকেই বসাবো।'

'নৌকায় যেও না, নবাব।' সকাতরে তাকে অনুরোধ করি।

'তাহলে এখানেই থাকি। আমি আর পারছি না, লুৎফা।' সিরাজ আমার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়তে চায়। দেখলাম, তার কপালের ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'না, চলো।' জানি, যেমন করেই হোক, যেতেই হবে থামলে চলবে না। হীরাঝিলের মায়া কাটাতে হবে, মুর্শিদাবাদকে ছাড়তে হবে। হয়তো বাংলাকেও ত্যাগ করতে হবে।

নিরুপায় হয়ে নৌকাতে গিয়ে উঠতে হয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে একজন পুরুষ সাধারণ কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এসে বলে, 'এগুলো বদলে নিন। আপনাদের পোশাক গঙ্গার জলে ফেলে দেবেন।'

'ও! বেশ, তাই দেবো।'

'আমি চলি।' পুরুষটি বলে।

'যাও। কিন্তু তোমার পরিচয় তো দিলে না। তবু শেষ নিঃশ্বাস ফেলা অবধি তোমার কথা মনে থাকবে।'

'সেইটুকুই আমার সৌভাগ্য।' তার কথায় দৃঢ়তা। বিন্দুমাত্র বাষ্প নেই তাতে।

'উপকারীর পরিচয় না পেলে ভালো লাগে না, একথা জানো তো?' সিরাজ বলে।

তবে শুনুন, নবাব আলিবর্দির সমাধির ওপরে একখানা লাল বস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, স্মরণ আছে আপনার?'

'হ্যাঁ আছে। কে দিয়েছিল নাম জানি না। তবে তাকে ভুলিনি, ভুলতে পারিনি। তাকে আসতে বলেছিলাম চেহেল-সেতুনে, কিন্তু সে আর আসেনি।'

'আমি তারই ছেলে।' পুরুষটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়।

নৌকার ওপর একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সিরাজ। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। ভুলে গিয়েছে যে, চোরের

মতো পালিয়ে যাচ্ছে সে। বুঝলাম, উপকারী বন্ধুর চিন্তা তার মন অধিকার করে রয়েছে।

'পোশাক বদলে ফেলো, নবাব।'

'আর নবাব বলে ডেকো না। অভ্যাসটা বড় খারাপ। অন্ধকারে কে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কে জানে। পাশেই ওই জেলে-নৌকাটি হয়তো তাদের। দেখলে না, যে বন্ধুটি পোশাক দিয়ে গেল, সে একবারও নবাব বলে ডাকেনি। কারণ সে জানে, তাতে বিপদ ঘটতে পারে।'

ঠিক সেই সময় পারের কোনো গাছ থেকে পেঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ আমার হাত চেপে ধরে বলে, 'দেখলে তো ধরা পড়ে গেলাম।'

'সে কি!'

'মীরজাফরের চরেরা চেঁচিয়ে উঠল, শুনলে না?'

'মানুষ নয়, পেঁচা ডাকলো। তুমি স্থির হয়ে বসো। মাঝ-নদীতে গিয়ে পোশাক বদলালেই চলবে।' বুঝলাম, পর পর কয়েকদিনের নিদ্রাহীনতা, পরিশ্রম আর দুর্ভাবনায় সিরাজের মস্তিষ্ক সুস্থ নয়।

'ও, পেঁচা? তাই বুঝি?' সিরাজ ছেলেমানুষের মতো হেসে ওঠে।

ভগবানগোলা অবধি সিরাজ একভাবে ঘুমোল। তবু ভালো যে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা জেনেও এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সে ঘুমোতে পেরেছে। তবে তার জন্য আমার চোখে একবারে ঘুম নেই।

ভগবানগোলায় মাঝিরা নৌকা ছেড়ে ডাঙায় যেতে চাইল কিছু খেয়ে নিতে। সিরাজের জন্যেও সামান্য কিছু আনতে বললাম তাদের। তারা আমাদের চেনে। তাই বলেছিলাম, কোনোরকম ভাল খাবার যেন আনতে চেষ্টা না করে। সাধারণ যাত্রীরা যা খায়, তা পেলেই চলবে।

মাঝিরা ফিরে এলো, সঙ্গে এক ফকির। বোরখা টেনে দিয়ে মাঝিদের খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করায় তারা বললো, 'খাবার তো আনিনি, দানাসায়েব নিজেই এলেন।'

'ইনি কে?'

'ফকির, খুব বড় ফকির।'

'কেন এলেন?' মনের ভয় চেপে রাখি।

'আমার সঙ্গে যাত্রী আছে শুনে উনি ছুটে এলেন।'

দানাসায়েব এবার নিজেই বিনীতভাবে বলে, 'আমার কুঁড়েঘর থাকতে বাজারের খাবার কেন খাবেন? মেহেরবানী করে সেখানে চলুন।'

'না-না, আমরা কোথাও যাবো না। আমরা নৌকাতেই থাকবো।'

'আপত্তি থাকলে যেতে বলছি না। তবে গেলে অনেক সুবিধে হতো।'

আমাদের কথাবার্তায় সিরাজের ঘুম ভেঙে যায়। সে সমস্ত শুনে দানাসায়েবের কুটিরেই যাওয়া স্থির করে। গোপনে আমাকে বলে, 'ভাগ্যই সব, লুৎফা। ভাগ্য খারাপ হলে শত চেষ্টাতেও নিজেকে বাঁচাতে পারবো না। তাই কোনো ব্যাপারে আপত্তি না করাই ভালো।'

দানাসায়েবের কুটিরে এসে কিন্তু ভালোই লাগল। হীরাঝিলে বাস করে কুটিরের এই শান্ত-শ্রীর কথা কল্পনা করা যায় না। এতটুকু জায়গা, অথচ পরিচ্ছন্ন আর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

সেখানে বসেই আমার চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। আর বসে থাকতে পারি না। সিরাজকে বলে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙল মানুষের চীৎকারে। ধড়মড় করে উঠে দেখি, দানাসায়েবের কুটির প্রাঙ্গণ সৈন্যসামন্তে ভরে গিয়েছে। সিরাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদেরই মধ্যে। আমাকে উঠে আসতে দেখে সিরাজ হেসে বলে, 'চললাম, লুৎফা।'

'কোথায়?'

'মুর্শিদাবাদে। এরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'আবার যুদ্ধ করবে? এরা বুঝি তোমারই লোক।'

'এককালে আমারই ছিল। এখন আর নেই। দেখছো না....' একজন পুরুষকে দেখিয়ে দেয় সে। আমি চমকে উঠি। মীরণ!

'তাহলে কি....'

'হ্যাঁ, বন্দী আমি।' অদ্ভুত শান্ত তার স্বর।

'তোমার খাওয়া হয়নি।'

'খেতে দিলো না এরা। তাছাড়া খাবারের ব্যবস্থাও করেননি ফকির-সাহেব। ওটা এখানে নিয়ে আসার অজুহাত।'

দানাসায়েব নির্লজ্জের মতো হি-হি করে হেসে বলে, 'মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাব বাহাদুর কত ভালো ভালো খানা খাবেন, আমি শুধু তারই ব্যবস্থা করেছি।'

'চলো, আমিও যাবো।' সিরাজের পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

'না, তোমাকে এখান থেকে ঢাকায় পাঠানো হবে। দাদিকেও সেখানে নিয়ে গিয়েছে এরা।'

'ঘসেটি বেগমদের?'

এতক্ষণে মীরণের মুখে কথা ফোটে। সে বলে, 'তারা এখনো মুর্শিদাবাদে আছে। তাদের ব্যবস্থা পরে করা হবে।'

'আমি সিরাজের সঙ্গে যাবো।'

'সম্ভব নয়।' মীরণের জবাব কঠিন।

'ওকে নিয়ে গিয়ে তোমরা কি করবে?'

'ঢাকায় বসে সব কিছুই আপনার কানে যাবে।'

সিরাজ বলে, 'চলি লুৎফা। জেদ করো না, লাভ নেই। ও তোমার সিরাজ নয়।'

'তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না?' চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে পড়ে। ইচ্ছে হচ্ছিল; উঠোনের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদি, কিন্তু বাংলার বেগমের পক্ষে সেটা দুর্বলতা। সিরাজ কৃষক নয়, আমিও কৃষক-পত্নী নই। কিন্তু হলে বড় ভালো হতো। কেঁদে শান্তি পেতাম।

সিরাজ এগিয়ে এসে বলে, 'দেখা হবেই আমাদের।' বুঝলাম, তার ইচ্ছে হচ্ছিল আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে, কিন্তু বোরখায় মুখ ঢাকা যে।

দেখা আর হয়নি। ঢাকায় এসে কিছুদিনের মধ্যেই সেই ভীষণ সংবাদ আমার কানে এলো। শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। ঢাকাতেও হাওয়া বয়। আমি ঢাকায় পৌঁছবার আগেই আমার সিরাজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু পথে সে-কথা আমাকে জানানো হয়নি। ওরা ভেবেছিল, জানালে আমাকে আর ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারবে না। ঠিকই ভেবেছিল।

নেমক-হারামির দেউড়িতে এক গুপ্ত প্রকোষ্ঠে সোফিয়ার স্বামী মহম্মদের তরবারিতে আমার সিরাজ প্রাণ হারিয়েছে।

নবাব আলিবর্দির বেগমও আমার মতো মূর্ছা গিয়েছিলেন, কিন্তু সে মূর্ছা আর ভাঙেনি। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ নবাব আলিবর্দির সময়ে যাঁর পরামর্শে রাজত্ব চলতো, তাঁর এই মৃত্যুর কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে কিনা জানি না।

একা থাকি ঢাকায়। পৃথিবীর সব রস শুকিয়ে গিয়েছে। গাছের পাতা পাংশু বর্ণ, আকাশের রং তামাটে। মানুষের চোখে দেখি রক্তের ক্ষুধা। তবু বেঁচে আছি। বেঁচে আছি ভরা যৌবন নিয়ে।

শুধু একটা ছোট্ট শিশুর মুখ মনের মধ্যে থেকে থেকে ভেসে ওঠে। সে-মুখের সঙ্গে সিরাজের মুখের কত মিল। তার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা আনচান করে ওঠে। তখন ঘরময় পায়চারি করি। সে কি আর বেঁচে আছে? আমাদের মতো হামিদাও বোধহয় পথের মাঝে ধরা পড়েছে। সিরাজের শেষ চিহ্নটুকু তার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে, তারই চোখের সামনে বোধহয় সিরাজের দেহের মতো খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছে শয়তানের দল।

ঘসেটি বেগম কোথায় রয়েছে কে জানে? আমিনা বেগমের খবরও রাখি না। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মীর্জা মহম্মদ নিরাপদে আছে কিনা জানি না। বলতে গেলে এই মীর্জা মহম্মদই আমিনা বেগমের নিজের ছেলে। সিরাজ ছিল নবাব আলিবর্দির কাছে, আর এক্রাম ছিল নওয়াজিস খাঁর সঙ্গে মতিঝিলে। তাঁর সবটুকু পুত্রস্নেহ সে একা ভোগ করেছে, সিরাজ আর এক্রাম ভাগ পায়নি।

হীরাঝিলেও আসতো না মীর্জা। তার মায়ের ভয় ছিল, পাছে কোনো চক্রান্তে পড়ে সে প্রাণ হারায়। তাকে শুধু আমি একবারই দেখেছি, নবাব আলিবর্দির সমাধিক্ষেত্রে। প্রায় সিরাজের মতো দেখতে, তবে দেহ অত সুঠাম নয়, একটু মেদবহুল আদুরে আদুরে ভাব। এক্রাম বড় হলে কিন্তু ঠিক সিরাজের মতো হতো।

বেগমগিরি আমার ফুরিয়ে গেল, কিন্তু প্রাণটুকু গেল না। সিরাজের নবাবী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণও গেল। সে ভাগ্যবান। নবাব আলিবর্দির আদরের নাতি হিসাবে যার জীবন শুরু, মসনদ হারিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে বিড়ম্বনা। কিন্তু আমি তো জারিয়া ছিলাম, আবার কি জারিয়া হবো?

দানাসায়েবের কুটির প্রাঙ্গণে মীরণের চোখে যে ইঙ্গিত দেখেছিলাম, সেদিন তা ভেবে দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না, কিন্তু আজ ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠি। মীরণ হয়তো আমাকে অন্যান্য বেগমদের মতো হারেমের আসবাব হিসেবে ধরে নিয়েছে। মূর্খ বুঝতে পারেনি যে, যে-বেগম পরাজিত নবাবের সঙ্গে সাধারণ জেলেডিঙিতে করে হীরাঝিল থেকে বিদায় নেয়, সে শুধু হারেমের শোভা নয়; তার প্রাণ আছে। বুঝবেই বা কি করে? কতই বা বয়স? আমার চেয়ে বোধহয় ছোটই হবে। অথচ সাপের বাচ্চা ঠিক সাপ হয়েছে। মীরবক্সীকুল মানে নবাব মীরজাফরের সব দোষটুকু পুঞ্জীভূত হয়েছে তার দেহ-মনে।

আর জারিয়া হতে চাই না। কারণ, তাহলে মীরজাফরের হারেমে থাকতে হবে। সেখানে সোফিয়া থাকবে, মীরণও যাবে।

কিন্তু মীরণ যা ভেবেছে তাও হবে না। নতুন করে বেগমগিরি যদি করাতে যায় জোর করে, তার আগে মরবো।

সিরাজহীন হয়ে বেঁচে থাকার যে এত জ্বালা জানতাম না। সে যদি অত্যাচারী হতো, দুশ্চরিত্র হতো, তবু যেন ভালো ছিল। জানতাম, সে বেঁচে রয়েছে। একদিন না একদিন অকস্মাৎ আমার কাছে আসবেই। কিন্তু এখন সে যে নেই। সে আর আসবে না।

মরতেও পারি না। মেয়েটা এখনও বেঁচে রয়েছে হয়তো। হীরাঝিলে একসময় আত্মহত্যা করার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। তখনও মেয়েটা আর সিরাজের কথা ভেবে পারিনি। তখন একদিন ছাদ থেকে

লাফিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে মেয়েটা পেটের মধ্যে নড়ে উঠেছিল, আর আজ সে আমার মনের মধ্যে নড়াচড়া করে।

ভয় হয়, কবে মীরণ সশরীরে এসে হাজির হবে, কিংবা প্রস্তাব পাঠাবে। দিনরাত শুধু সেই ভয়েই থাকি। আমার সিরাজ নেই, এখন আমি অসহায়।

কিন্তু প্রস্তাব এলো না। মীরণও এলো না। পরিবর্তে এলো বাংলার ভূতপূর্ব নবাবের বেগম হিসাবে আমার মাসোহারা। সায়েবরা নাকি এ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকবো, মাসে মাসে কিংবা বছরে এইভাবে পেয়ে যাবো। নিশ্চিন্ত হলাম। একবার যখন সিরাজের বেগম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছি, তখন আমাকে নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া করবে না কেউ। মীরণের কবল থেকেও রক্ষা পেলাম।

বুড়ি জবেদা আমার কাছে থাকে। সে জারিয়া নয়। নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ যখন ঢাকায় ছিলেন, সে তখন তাঁর কাছে থাকতো।

আমি যেদিন ঢাকায় এলাম, তার দু'চারদিন পরে সে এসে কেঁদে আকুল। চিনতাম না তাকে। তাই অপরিচিতা বৃদ্ধার কান্নায় অপ্রস্তুত হয়ে কারণ জানতে চেয়েছিলাম। তখনই আমার জীবনের সব চাইতে বড় সর্বনাশের কথা প্রথম জানাতে পারি। এর আগে সবাই জানতো, অথচ আমাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। এত বড় দুঃসংবাদ সেদিন সে দিয়েছিল, অথচ তাকে তাড়িয়ে দিইনি। তারই কোলের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। মূর্ছা ভাঙলে তাকেই জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলাম। তাকে দেখে মনে হয়েছিল, আমার ছেলেবেলার সেই বৃদ্ধা জারিয়ার কথা, আমাকে মানুষ করেছিল যে, যতদিন সে বেঁচেছিল, নিষ্করুণ বেগমমহলে একটু আদর আর স্বাদ শুধু তারই কাছে পেয়েছিলাম।

জবেদার কান্নায় সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকা কতদূর? অথচ এত দূরেও সিরাজদৌল্লার বিচ্ছেদে কাঁদে এমন মানুষও আছে।

মাসোহারা পেয়ে একটু আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে মেয়েটা বেঁচে থাকলে তাকে আর হামিদাকে কাছে এনে রাখতে পারবো। সেই খবর জবেদাকে দিতে গিয়ে দেখলাম, প্রথম দিনের মতো সে আবার কাঁদছে।

'কাঁদছিস্ কেন, জবেদা?' আমার বুক দুরুদুরু করে। ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে। আজকাল কথায় কথায় অমন হয়।

'আপনাকে শুধু দুঃসংবাদ দেবার জন্যেই কি আল্লা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন?'

'কী দুঃসংবাদ? আমার মেয়ে কি বেঁচে নেই?'

'সেইটুকুই শুধু ভালো খবর। আপনার মেয়ে বেঁচে আছে।'

'সত্যি বলছিস্, আমার মেয়ে বেঁচে আছে?' জবেদার চুপসে যাওয়া গালে অজস্র চুমু খেতে লাগলাম। ভুলে গেলাম যে আমি বেগম ছিলাম।

'এ কি করছেন? তটস্থ হয় বৃদ্ধা।

'তুই আমাকে আজ কি দিলি জানিস্ না। তোকে তো কিছু দেবার নেই আমার। শুধু এই মালা-ছড়াটা আছে, নে। সিরাজ থাকলে তোকে আমি কি যে করতাম জানিস্ নে, জবেদা।'

'ও মালা আপনি রেখে দিন। আমি কি করবো ওটা নিয়ে? আমার কি কেউ বেঁচে আছে? সেবারের বানে সব ভেসে গিয়েছে। জোয়ান ছেলে গিয়েছে, বৌ গিয়েছে, নাতি গিয়েছে, বুড়োও মরলো তার ঠিক পরেই।'

'তবু নে। যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দিস্।'

'আপনার কাছে রেখে দিন। মেয়েকে দেবেন। এতদিন পরে যাচ্ছেন।'

'কোথায় যাচ্ছি!' অবাক হই।

'মুর্শিদাবাদে। আপনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'সে কি! কেন? বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মীরণের মুখখানা চোখের সামনে দাপাদাপি করে।

'খোসবাগে থাকবেন আপনি। নবাব সিরাজদ্দৌলা যেখানে রয়েছেন। আপনি খোসবাগের দেখাশোনা করবেন। সায়েবদের হুকুম হয়েছে নবাব মীরজাফরের ওপর।'

খোসবাগ! কি শান্ত কথা! সিরাজ শুয়ে রয়েছে সেখানে। আমি সেখানে যাবো। আমার এমন সর্বনাশ করার পরও সায়েবদের এ দয়া কেন? নারীর অভিশাপের ভয়ে? সে সব বালাই কি তাদের রয়েছে? হয়তো আছে, নইলে গাছের গোড়া কেটে আবার তাতে জল ঢালা কেন? তবু এতে যেন মন সত্যিই শান্তি পাচ্ছে।

'কে বললো এ কথা? কার কাছে শুনলি?'

'যে খবর এনেছে, সে আবার আসবে। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন বলে ফিরে গিয়েছে।'

'তুই কি পাগল হলি, জবেদা? তুই তো জানিস, আমি ঘুমোই না।'

'জানি। কিন্তু আপনি তখন ভাবছিলেন নবাবের কথা। আপনার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। আমি গিয়ে দাঁড়াতেও আপনি টের পেলেন না। সে সুখস্বপ্ন ভাঙাতে চাইনি আমি।'

জবেদা সব বোঝে। সেও যে আমার মতোই দুঃখিনী। জেগে জেগে আমারই মতো স্বপ্ন দেখে সে। জেগে জেগেই কত সময় সদ্য ফেলে আসা অতীতের মধ্যে ফিরে যাই আমি। ভুলে যাই যে, আমি ঢাকায় রয়েছি। মনে হয়, হীরাঝিলের সেই সজ্জিত কক্ষে বসে রয়েছি, সিরাজ সামনে দাঁড়িয়ে। সিরাজের স্পর্শও অনুভব করি। কিন্তু তারপরই রূঢ় বাস্তব সে-স্বপ্ন ভেঙে দেয়। তাই আমি কেঁদে ফেলি।

জবেদা বলে, 'আপনি চলে যাবেন, তাই কাঁদছিলাম।'

'তুই বড্ডো হিংসুটে জবেদা। এ তো সুসংবাদ। খোসবাগে থাকবো আমি, সেখানে সিরাজের কাছে প্রতিদিন বাতি দেবো। ধীরে ধীরে আমার দেহে আসবে বার্ধক্য—নুয়ে পড়বে আমার শরীর। তবু কম্পিত হাতে বাতি নিয়ে গিয়েই হয়তো ঢলে পড়বো তার পাশে, আর উঠবো না। এর চেয়ে সুখ আর কি আছে রে জবেদা? এরজন্যে তুই কাঁদিস?'

'আর কাঁদবো না, বেগমসায়েবা। সত্যি আমি হিংসুটে। নিজের দিকে শুধু আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখ হয়, ঘসেটি বেগম আর আমিনা বেগমের জন্য। শেষে এই হাল হলো তাঁদের।'

'কি হয়েছে? কোনো খবর এসেছে?'

'হ্যাঁ। সেই কথাই তো বলতে বাধছিল এতক্ষণ। মীরণের হুকুমে তাঁদের ডুবিয়ে মারা হয়েছে। মাঝ-নদীতে বজরা নিয়ে গিয়ে বজরা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আমার অনুভূতি শক্তি নিশ্চয় অনেক কমে গিয়েছে ঘা খেয়ে-খেয়ে। নইলে এ সংবাদে বিশেষ বিচলিত হলাম না কেন? কিংবা সিরাজের কাছে ফিরে যাবো বলে, মেয়েটাকে পাবো বলে একটু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি কি?

আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে এলাম। এ মুর্শিদাবাদের মসনদে সিরাজ নেই। এখানকার পুরোনো মহলে আমিনা বেগম ঘুরে বেড়ান না। মতিঝিলে নেই ঘসেটি বেগমের দাপট। তবু মুর্শিদাবাদ আছে—আগের

মতোই রাস্তায় লোকও চলছে। ছেলেরা খেলা করছে। ভেবেছিলাম এসে দেখবো, গাছপালার সব পাতা ঝরে গিয়েছে, গঙ্গার জল শুকিয়ে গিয়েছে। মানুষের মুখ হয়েছে রক্তশূন্য। কিন্তু তা তো নয়। সবই আগের মতো আছে। শুধু সে নেই।

কিরীটেশ্বরীর মেলায় যাবার জন্যে হিন্দুরা আগের মতোই খেয়া পার হচ্ছে। কাটরার মসজিদে তেমনি আজানধ্বনি। গঙ্গা বয়ে চলেছে, যেমন বয়ে চলতো মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে। এমনি বয়ে চলবে চিরকাল—যখন মীরজাফর থাকবে না, মীরণ থাকবে না, ইংরেজরা থাকবে না, কেউ থাকবে না। হাওয়ায় এখনো গাছে কাঁপন লাগে।

সবাই নেমক-হারাম। কিছুই মনে রাখতে চায় না। কেউ স্বীকার করে না, এই মুর্শিদাবাদের মসনদে কিছুদিন আগেও এক সুন্দর যুবক শোভা পেতো। বালক হয়েও যে বর্গীর হাঙ্গামার সময় দিনরাত ছোটাছুটি করেছে দেশকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্যে, সে আজ নেই। সবাই সব ভুলেছে, শুধু আমি কিছুই ভুলিনি।

জোড়া বলদে টানা একখানা সাধারণ গাড়িতে করে মুর্শিদাবাদের রাস্তা দিয়ে আমি চলেছি খোসবাগের দিকে। আর নাকি বেশিদূর নেই।

বুকের ভেতর কাঁপন ধরেছে। মুখ গরম হয়ে উঠেছে। এমন গরম হলে নাকি মেয়েদের মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা ভাব। কিছুতেই নিজেকে সহজ করতে পারছি না। যুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো কাজে বাইরে গিয়ে বহুদিন পরে সিরাজ ফিরে এসে আমার কাছে এলে অমন হতো। কি বলবো ভেবে পেতাম না, কি করবো তাও বুঝতে পারতাম না। কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকতো, দু-পা জড়িয়ে আসতো, আজ আবার ঠিক তাই হচ্ছে।

গাড়ি যত এগিয়ে চলেছে, বুকের কাঁপুনি ততই বাড়ছে। মনকে কতবার শান্ত করবার চেষ্টা করি, পারি না। মন অবাধ্য—সিরাজের কাছে গেলে চিরকাল যেমন অবাধ্য হয়েছে। গাড়োয়ান শেষে এক জায়গায় এসে থেমে যায়।

'এখানেই নামতে হবে। গাড়ি আর ভেতরে যাবে না।' সে বলে।

সামনে চেয়ে দেখি, রাস্তা শেষ হয়েছে একটা উঁচু দরজার কাছে এসে। সেটা বন্ধ। এই তো সেই জায়গা। নবাব আলিবর্দির মৃত্যু হলে এখানেই তো এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন তো এত নির্জন ছিল না জায়গাটা।

দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গাটার ভেতর থেকে আমগাছের শাখা-প্রশাখা প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরে এসে ঝুলে পড়েছে। ভেতরে পাখিদের মেলা বসেছে। তাদের কিচিরমিচির ডাকে কান ঝালাপালা।

গাড়ি থামিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও চুপ করে বসে থাকি। জানি যে, উঠে দাঁড়াতে পারবো না, পড়ে যাবো। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ে আমার—হাঁপালে যেমন হয়।

যে বাঁদী এসেছিল আমার সঙ্গে, সে একটু অবাক হয়। বলে, নামুন বেগমসায়েবা।

'এই নামছি, আমাকে একটু ধরবি? পায়ে ঝিঁঝি লেগেছে।'

সে তাড়াতাড়ি এসে আমাকে ধরে। তার কাঁধে দেহের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে পড়ি।

'এই হলো খোসবাগ—গোরস্থান।' বাঁদী বলে।

'ছেড়ে দাও আমাকে।'

'আপনি যে বললেন.....

কী বিশ্রী কথা! মনে হলো, এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিই।

'ছেড়ে দাও।' কথাটা একটু জোরে হয়েছিল। সে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়।

'দরজা বন্ধ কেন? প্রশ্ন করি।

'এই যে চাবি, নিন।' সে খোসবাগের চাবি আমার হাতে দেয়।

প্রকাণ্ড দরজা। দারোয়ান গায়ের জোরে ঠেলে খোলে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ফুলের গন্ধ এসে মন জুড়িয়ে দেয়। নানান গাছ আর লতাপাতায় মিশে একটা স্তব্ধ কুঞ্জ।

ভেতরে প্রবেশ করতেই পাখির ডাক থেমে যায়। আমাদের দেখে বোধহয় বিব্রত হয়েছে তারা। প্রাণভরে সিরাজকে গান শোনাচ্ছিল, বাধা পেলো আমাদের আগমনে। ফিরে এসে আবার প্রাচীরের বাইরে দাঁড়াই, যদি তারা শুরু করে তাদের গান।

'ভেতরে যাবেন না, বেগমসায়েবা?'

'চুপ।' কিন্তু পাখিরা আর ডাকে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও নয়।

হতাশ হয়ে আবার ভেতরে যাই। দরকার নেই পাখির গানে, আমি শোনাবো গান আমার সিরাজকে।

'তুমি এখন যেতে পারো।' বাঁদীকে বলি।

'আপনার এখানেই থাকবো আমি।'

'থাকো, কিন্তু এখন একটু বাইরে যাও।' সিরাজকে আমি একা পেতে চাই, যেমন পেতাম হীরাঝিলে। প্রিয় মিলনের সময় বাইরের লোকের উপস্থিতি—ছি ছি!

বাঁদী চলে যায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই, যেখানে নবাব আলিবর্দির সমাধি রয়েছে—শুনেছি তাঁর কাছেই রয়েছে সে।

রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত সমাধি। তার পাশেই এ কি! সেই কৃষ্ণবস্ত্র—আলিবর্দির মৃত্যুদিনে সিরাজ যে বস্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন মূল্যবান বস্ত্রটির অপচয় হবে ভেবে অনেক রাজা-উজির মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। শেষে মৌলানার কথার জবাবে সিরাজ কি বলেছিল, এখনো কানে স্পষ্ট ঝংকৃত হচ্ছে, 'নবাব বংশ এখনো নির্বংশ হয়নি।' কথাটা শেষে এইভাবে সত্যি হলো?

লুটিয়ে পড়ি। আমার সিরাজ! মনে হলো, কে যেন হেসে উঠল। নবাব আলিবর্দি কি? আদরের নাতিকে কাছে পেয়ে আমার দুর্দশা দেখে হাসছেন তিনি। না, তিনি নন। তিনি হাসবেন না। তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে বিভীষিকার মধ্যে কচি শিশুকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে শক্ত-সমর্থ করে গড়ে তুলতেন না। মৃত্যুশয্যায় তাকে কাছে ডেকে নিয়ে কোরান স্পর্শ করে শরাব খাওয়া ছাড়াতেন না। ভালোবাসার প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যেও তাঁর একান্ত সাধ ছিল, সিরাজ হবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সার্থকতম নবাব। তাঁর সে-সাধ পূর্ণ হলো না বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে। তাই নাতিকে কাছে পেয়েও এক তীব্র বেদনা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আলিবর্দি হাসতে পারেন না।

খোসবাগের প্রবেশ পথে চোখ পড়ে। দেখি, সেখানে বাঁদী গাড়োয়ানের সঙ্গে হাসাহাসি করছে। সেই হাসিই তবে কানে এসেছে।

পাখিরা আবার মিষ্টি গান গাইতে শুরু করেছে। তারা বুঝে ফেলেছে, আমি তাদেরই। এই কৃষ্ণ আর রক্তবর্ণ বস্ত্রের পাশে এক শুভ্রবর্ণ বস্ত্র মাত্র। আমার আলাদা কোনো সত্ত্বা নেই।

গাছের পাতা ঝরে পড়ছে, ফুল দুলছে। দুই সমাধির ওপর অজস্র ফুলের গালিচা.....আরও ঝরছে। আমার অশ্রু ঝরছে। তারা নিঃশেষিত হতে চায়। কী ব্যথা আর কী আনন্দ!

'বেগমসায়েবা।'

'কে?' পেছন ফিরে দেখি বাঁদী। 'কে তোমাকে আসতে বললো এখানে?'

সে কথা বলে না।

'তোমাকে কে পাঠিয়েছে এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে?'

'নবাব।'

'নবাব! ও, মীরজাফর?'

'হ্যাঁ, বেগমসায়েবা।'

'আগে তুমি কোথায় থাকতে?'

'জাফরাগঞ্জে।'

'তোমাকে আমি চাই না।'

'নবাবের হুকুম।'

'নবাবকে বলো, তার হুকুম আমি মানি না।'

বাঁদী চমকে ওঠে।

'হামিদাকে চেনো?'

'হ্যাঁ, সে আসবে। সে এলে আমি চলে যাবো।'

'তুমি এখনই যাও। আমি একা থাকবো।'

'আপনার অসুবিধে....'

'কিছু অসুবিধে হবে না। তুমি চলে যাও।'

বাঁদী চলে যায়।

ছুটতে ছুটতে আসে হামিদা। তার কোলে সিরাজের অবশিষ্ট। হামিদা ছোটে আর হাসে, সে ছোটে আর কাঁদে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি। সে কাছে এলে তাকে জড়িয়ে ধরি।

'আমাকে নয় বেগমসায়েবা, আমাকে নয়। এই যে একে ধরুন।' সে মেয়েকে দিতে চায় আমার কোলে।

'না-না, তুমি হামিদা। ও নয়।'

'বেগমসায়েবা, আমি জারিয়া।'

'আমিও জারিয়া ছিলাম, হামিদা। আজ তুমিও জারিয়া নও। তুমি নবাব মহলে নেই এখন। বেগম মহলেও নেই। তুমি আছো আমার কাছে। আমার কাছেই থাকবে। তুমি আমার বোন, হামিদা।'

মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে সে এতক্ষণে আমাকে দু'হাত দিয়ে আকুলভাবে বেষ্টন করে ফেলে। সে-হাত দুটোয় কোনো সঙ্কোচ নেই, কোনো দ্বিধা নেই—বোনের হাতের মতোই মায়া-ভরা, স্নেহ-ভরা। মনে হলো, ঘসেটি বেগমের আদেশে তার যে বোনকে একদিন ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাকেই এতদিনে ফিরে পেয়েছে সে।

পাখির ডাক থিতিয়ে আসে, অন্ধকার নেমে আসে ধীরে ধীরে। এ রাত্রি যদি আর কখনো না কাটে। গাছের পাতায় ঝিরঝিরে বাতাসের শব্দ। এ বাতাস ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে যদি প্রলয় ঘটিয়ে একরাত্রে পৃথিবীকে রসাতলে দেয় খুব ভালো হয়।

'শুধু নবাব আলিবর্দি আর নবাব সিরাজদ্দৌলা নন, আর একজনও এসেছেন এখানে।' হামিদা

বলে।

'কে সে? কোন্ হতভাগ্য?' নতুন একটা সমাধি আমিও দেখেছি খোসবাগে—নগ্ন হয়ে রয়েছে অবহেলিত অবস্থায়। প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম বুঝি সমাধি নয়।

'মীর্জা মহম্মদ। নবাব সিরাজদ্দৌলার শরীরে যে-রক্ত, তাঁর শরীরেও যে সে-রক্ত ছিল। তিনি কি বেঁচে থাকতে পারেন?'

'হুঁ। আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। আমিনা বেগমের স্নেহের পুতুল। তার কাছেও বাতি দেবো, হামিদা।'

'মীর্জা মহম্মদ নবাবের চেয়েও হতভাগ্য। নবাবকে মৃত্যুযন্ত্রণা পেতে হয়নি। মীরণের সে ইচ্ছে থাকলেও, নবাবের চোখের দিকে তাকিয়ে শয়তান মহম্মদ বোধহয় কেঁচোর মতো কুঁচকে গিয়েছিল। কোনোরকমে এক আঘাতে শেষ করে পালিয়েছিল। তাই তাঁর মৃতদেহ নিয়ে অত তাণ্ডব চলেছিল।'

'থাক্ থাক্ হামিদা, আমি শুনতে চাই না।'

'শুনতে হবে বোন, সব শুনতে হবে। নবাবের দেহ নিয়ে ওরা যত বীভৎস কাণ্ডই করুক না, নবাবকে তা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু মীর্জাকে এরা তিলে তিলে মেরেছে। শরীরের দু'পাশে দুটো তক্তা রেখে চেপে ধরে হত্যা করা হয়েছে।'

'হামিদা, ওরা কি মানুষ?

'হ্যাঁ বোন, এরা মানুষ। পৃথিবীতে অমানুষ জন্মাতে পারে না। তাই স্বার্থের নেশায় প্রলোভনে পড়ে, কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, মানুষের মনুষ্যত্ব কিছুকালের জন্যে মন থেকে উধাও হলেও, পরে তা আবার ফিরে আসে। ফিরে আসবেই। তখনই হয় অনুশোচনা, তখনই হয় অশান্তি। মহম্মদ শুনেছি পাগল হয়ে গিয়েছে।'

'আর সোফিয়া?'

'সে এখন সৈন্যসামন্তদের উপভোগের সামগ্রী।'

'আম্মা.....'

চেয়ে দেখি, মেয়েটা ডাকছে। আমার সিরাজের মেয়ে—সিরাজের মুখের আদল। দু'হাত দিয়ে তার মুখ উঁচু করে ধরে বলি, 'ডাকছো আমাকে?'

'ন্না।' সে হামিদাকে দেখিয়ে দেয়।

'ও আমাকেই মা বলে জানে।' হামিদা হেসে বলে।

'সেই ভালো। আমি আর মা হতে চাই না, হামিদা। আমি শুধু বেগম—আমি সিরাজের বেগম।'